অরুণচন্দ্র গুহ

বিজয়ী প্রাচ্য	১॥০
ভাবী এশিয়া	॥০
চন্দ্রগুপ্ত	॥০

যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়

ভারতে সমর সঙ্কট	১॥০

ধীরেন্দ্রনাথ সেন

কার্লমার্ক্স ও তাহার মতবাদ	।৵০

বীরেন সেন

বলশেভিক বিদ্রোহ	১॥০
প্রাচীন জগৎ	১॥০

ডাঃ তারকনাথ দাস

বিশ্বরাজনীতির কথা	১॥০
Rabindra Nath Tagore	Re. 1.

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীনতার পথ	১।০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তরুণের বিদ্রোহ	।০

কালীচরণ ঘোষ

ভারতের পণ্য	১।০

অমলেন্দু দাসগুপ্ত

ডেটিনিউ (যন্ত্রস্থ)

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস—৩ খণ্ড	১০৲
রাজনীতি —	২৲

১৪৮

রাজনীতি

[মেকিয়াভেলির PRINCE পুস্তকের বঙ্গানুবাদ

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

কর্ত্তৃক অনূদিত

সরস্বতী লাইব্রেরী
কলেজ স্কয়ার ঈষ্ট
কলিকাতা

শ্রীকিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সরস্বতী লাইব্রেরী
কলেজ স্কয়ার ঈষ্ট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

এক টাকা
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় কর্ত্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ,
রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

কৈফিয়ৎ

অনেক দিনের কথা। ১৯১০ সাল। আমি তখন বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। হঠাৎ একদিন কথায় কথায় আমি আমাদের পরম ভক্তিভাজন বিখ্যাত জন-নায়ক ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের কাছে একটা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেছিলাম। কেমন করে কি প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল, সেই কথাটাই এখানে বলব এবং সেইটেই আমার এই বই লেখার কৈফিয়ৎ।

বরিশাল বাল্যাশ্রমের সরস্বতী পূজার উৎসব উপলক্ষে একদিন ধর্ম্ম-রক্ষিণী সভা-গৃহে একটা সাধারণ সভা বসেছিল। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ৺অশ্বিনীকুমার অনাহুত সেই সভায় এসে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি সবেমাত্র রাজবন্দীর কারাবাস থেকে মুক্ত হ'য়ে বরিশালে ফিরে এসেছেন। সরস্বতী পূজা ও সেই উপলক্ষে বিবিধ উৎসবের আয়োজন প্রচেষ্টার জন্য সে বছরে বাল্যাশ্রমের পক্ষ থেকে যে কার্য্যকরী সমিতি নির্ব্বাচিত হ'য়েছিল, আমি ছিলাম তার সম্পাদক। সেই হিসেবে আমি সভার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ৺অশ্বিনীকুমারকে অনুরোধ জানালাম সেই সভায় আমাদের কিছু উপদেশের বাণী শোনাতে। তিনি অমনি বলে উঠলেন :—"জীবনে বক্ বক্ ক'রে অনেক বকেছি—আর নয়। আর হবে-ই বা কি কতগুলা কথা আওড়ে। কেউ তো কোনো কাজ করবিনে তোরা—খালি কথা আর কথা। করবি কাজ? এই দেখ না: যে কোনো ভাষায় একখানা ভাল বই বেরোলে, ইংরেজী ভাষায় তৎক্ষণাৎ তার তর্জ্জমা হয়। কিন্তু বাংলা ভাষায় ক'খানা তর্জ্জমাকরা 'বই আছে? অথচ আমি বিশ্বাস করি—

আজকালকার শিক্ষিত যুবকেরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু বাংলা ভাষা লিখতে পারে এবং যা পারে, তাতে তার সমগ্র জীবনের চেষ্টায় অন্ততঃ একখানা ভাল বই সে তর্জ্জমা করে বার করতে পারে। পারে না? আলবৎ পারে। কিন্তু করে কে? এই ব্রজমোহন কলেজ থেকে বছরে বছরে যে এত ছেলে বি-এ, পাশ ক’রে বেরোয়, তারা কোন্ কর্ম্মটা করে? কোনো রকমে শুয়ে বসে দিন কাটানো—এই তো তোদের কাজ। এই তো এতগুলো ছেলে এখানে আছিস, কেউ বলতে পারিস যে একখানা বই অন্ততঃ তর্জ্জমা করে ছাপাবি?”

অশ্বিনীকুমার আমাকে লক্ষ্য করেই কথাগুলি বলেছিলেন। আর কেউ কোনো জবাব দিচ্ছে না দেখে আমাকেই আবার কথা বলতে হোলো। আমি বললাম—“সবেমাত্র প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। বই লিখবো—এমন একটা কল্পনা করাও তো এখন আমাদের পক্ষে মুস্কিল!”

৺অশ্বিনীকুমার জবাব দিলেন—“আমি কি এখনই লিখতে বলছি—বড় হ’—লেখাপড়া শেখ্, তবে তো লিখতে পারবি! এখন অন্ততঃ এই কথাটা বল না যে বড় হ’য়ে লিখবার মত যোগ্যতা হ’লে, তবে লিখবি। আমি তাতেই খুশী হব।”

একথার পরে আর তর্ক করা চলে না। তখন বাধ্য হ’য়েই আমার কথা দিতে হোলো। প্রায় তিরিশ বছর পূর্ব্বে এক রকম দায় ঠেকে যে একটা কথা দিয়েছিলাম, তার প্রভাব আজিও আমার জীবনে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। যাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতাম—খুব বড় বলে মনে করতাম, তাঁর কাছে কথা দেওয়াই বোধ হয় এর কারণ এবং সেই প্রভাবটাই আজ এই ছাপা বইয়ের আকারে মূর্ত্ত হ’য়ে উঠেছে।

১৯১৬ সনে আমি ১৮১৮ সনের তিন আইনের রাজবন্দী হ’য়ে জেলে যাই। সেখানে পড়া ভিন্ন কোনো কাজ ছিল না। কিন্তু নিজের রুচি

ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী বই পাওয়া তখনকার দিনে একেবারেই অসম্ভব ছিল। আলিপুর জেলে হঠাৎ একদিন মেকিয়াভেলির "প্রিন্‌স্‌" বইখানা হাতে পড়লো। বইখানা পড়তে পড়তে হঠাৎ আমার মনে জাগলো বহুদিন পূর্ব্বের আমার সেই প্রতিশ্রুতি দানের কথা। ভাবলাম—"এই বইখানা বিশ্ব-সাহিত্যে অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করেছে—'ক্লাসিক্‌' হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেকিয়াভেলির রাজনীতিক মতবাদ যতই পুরানো হোক না, এই বইখানার বিজ্ঞানসম্মত রাজনীতি আলোচনার বৈশিষ্ট্য ও সাহিত্যিক মাধুর্য্য কখনো ক্ষুণ্ণ হবে না। এমনি একখানা বই তর্জ্জমা করে বের করতে পারলে অশ্বিনীকুমারের মত একজন মহাপুরুষের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতির সম্মান রক্ষা হয়।"

অতি আগ্রহের সঙ্গে 'প্রিন্‌স্‌'-এর তর্জ্জমা আরম্ভ করা গেল। অল্প কিছুদিন পরেই আলিপুর জেল থেকে বর্দ্ধমান জেলে এবং সেখান থেকে হাজারীবাগ জেলে বদলী হয়ে গেলাম। সেখানে আর এ বই পাওয়া গেল না। বই একখানা নিজের পয়সায় কিনবার জন্য গভর্ণমেণ্টের কাছে অনুমতি চেয়ে পাঠালাম। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট জানিয়ে দিলে যে, তাদের মতে এরূপ বই আমাদের মত অপক্ক ছেলেরা পড়লে তাদের মাথা বিগড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। কাজেই এক তৃতীয়াংশ লেখার পরে বইয়ের তর্জ্জমা বন্ধ হ'য়ে গেল।

১৯২০ সনে জেল থেকে বেরিয়ে আসতেই অসহযোগ আন্দোলনের আবর্ত্তের ভিতরে পড়ে বই লেখার কথা প্রায় ভুলেই গেলাম। হঠাৎ এক দিন এক বইয়ের দোকানে বইখানা দেখে কিনে নিয়ে এলাম। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই—বই লেখায় হাত দেওয়া আর হয়ে উঠলো না।

১৯২৩ সনে সরকারের হুকুমে আবার রাজবন্দী হ'য়ে জেলে যাই। বাইরের কর্ম্ম-চাঞ্চল্যের মাঝে প্রতি মুহূর্ত্তের বর্ত্তমানকে নিয়ে

মানুষের মনটা থাকে ত্রস্ত ব্যস্ত। কিন্তু রাজবন্দীর কর্ম্মহীন জীবনের সুদীর্ঘ অবসরের দিনে মনটা তাঁর অতীত স্মৃতির ঝাঁপি খুলে বসে—তা-ই নিয়ে নাড়াচাড়া করাই তার একমাত্র কাজ হ'য়ে ওঠে। ভবিষ্যৎ তার একান্তই অনিশ্চিত। বর্ত্তমান ঘটনাহীন, কর্ম্মহীন, ফাঁকা। তাই অতীতের রোমন্থনই তার পরম সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয়বার জেলে গিয়ে আমার স্মৃতির ঝাঁপি থেকে বেরিয়ে পড়লো সেই পুরোণো প্রতিশ্রুতির পরিচিত লিখনখানি। মনে পড়লো এক দিনকার হঠাৎ খেয়ালের বশে কিনে-রেখে-দেওয়া "প্রিন্স্" বইখানার কথা। এবারে কিন্তু বই পেতে কোন অসুবিধা হ'লনা—বইখানা আসা মাত্র জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ আমায় দিয়ে দিলে।

খুব উৎসাহের সঙ্গে বইয়ের তর্জ্জমা সুরু করে দিলাম। কিন্তু উৎসাহ যত জোরে দৌড়ায়, হাতের কাজ তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারে না। দেখা গেল তর্জ্জমা যে হারে এগোচ্ছে তাতে বছরের পরেও তা' শেষ পাতায় পৌঁছবে না। মনটা বড়ই দমে গেল। ক্রমে লেখাই গেল বন্ধ হয়ে। কিন্তু মনটা খুঁত্ খুঁত্ করতে লাগলো। কাজ সুরু করে ফেলে রাখা—মন তাতে খুশী হতে পারে না। অথচ মন যে কাজে একেবারেই রস পায় না, সে কাজ তাকে দিয়ে আদায় করাও মুস্কিল। বইখানার তর্জ্জমা করা খুবই শক্ত মনে হচ্ছিল। লেখক এমনি হিসেব করে ভাষা লিখেছেন যে, তার লেখার একটি শব্দও বাদ দেওয়া কিম্বা আগের শব্দ পরে বসান চলে না। লেখক নিজেই বলেছেন যে, তাঁর বইতে কোনোখানে একটি অনাবশ্যক কথা নেই। বইয়ের আলোচনার বিষয়টাও বেশ শক্ত। এরূপ শক্ত বইয়ের তর্জ্জমা আশানুরূপ তাড়াতাড়ি এগোতে চায় না বলে অনুবাদকের মনটা কেবলি ঠোকর খেয়ে খেয়ে নেতিয়ে পড়তে থাকে। আমারও তখন সেই অবস্থা।

কয়েক দিন পরে মনে হ'ল যে তাড়াতাড়ি শেষ করার ব্যস্ততাই মনটাকে এত শীঘ্র পঙ্গু করে' দিয়েছে। ব্যস্ত-বাগীশ লোক হড়্‌বড়িয়ে কাজ করতে গিয়ে সহজেই ধৈর্য্যহারা হয়ে পড়ে—ছোট খাট বাধার সঙ্গে বোঝা-পড়া কর্‌তে হ'লেও মনের উৎসাহ অল্পতেই নষ্ট হ'য়ে যায়। কিন্তু কি দরকার আমার তাড়াহুড়ো করে'—কারাবাসের সুদীর্ঘ অবসরের মাঝে সময়ের তো অভাব নেই।

স্থির করা গেল—প্রতিদিন বইয়ের একটা করে পৃষ্ঠা তর্জ্জমা করা হবে। নির্দ্দিষ্ট খানিকটা কাজ প্রতি দিনের জন্য বেঁধে নেওয়ার ফলে কাজটা একটু একটু করে' বেশ এগোতে লাগলো। যে দিন কলম ধরতে মোটেই ইচ্ছা হোতো না কিম্বা সুরু করার পরে ভাষার কাঠিন্যের দরুণ ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়ার সম্ভাবনা ঘটতো, 'একটা পৃষ্ঠা শেষ করতে পারলেই তো খালাস' এই ভরসায় সেদিনও মনটাকে ধরে বেঁধে কোন রকমে অতটুকু কাজ করিয়ে নেওয়া যেতো।

এই ভাবে বহু দিনের চেষ্টায় বইয়ের তর্জ্জমা শেষ হ'য়ে গেল। তার পরে, লেখকের ভূমিকাও এই কৈফিয়তের মত একটা কৈফিয়ৎ তাও লিখে রাখা গেল। মোটের উপরে বই প্রেসে দেবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত করে রেখে দেওয়া হ'ল।

১৯২৮ সনে বন্দীবাস থেকে মুক্ত হয়েই সেবারকার কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনের আয়োজন চেষ্টার ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ছোট খাট কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন কর্ম্মকর্ত্তা বিশেষ—খাদি প্রদর্শনীর সম্পাদক। তাই ১৯২৮ সনের কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হওয়ার পূর্ব্বে আর বই ছাপাবার কথা মনেও আনতে পারিনি। তার পরে কংগ্রেসের হাঙ্গামা চুকে যেতে না যেতে-ই হঠাৎ ব্যবসা উপলক্ষে চলে গেলাম মাদ্রাজ। ফলে তখনও বইটা প্রেসে দেওয়া হ'য়ে উঠল না। একটা কথা

আছে—কাজ ফেলে রাখতে নেই। ফেলে রাখলে, কাজের উপযুক্ত সময়টা যায় সরে—পরে হয়তো আর কখনই সে কাজের সুযোগ জোটে না। এই বইখানা ছাপান সম্বন্ধে অন্ততঃ এই কথাটা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। ১৯৩০ সনে মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে হাওড়া ষ্টেশনে নামতেই পুলিশ এসে মাল তল্লাশ করে আমার হাতে লেখা খাতাগুলি সব নিয়ে গেল—তার সঙ্গে ‘প্রিন্‌স্’এর তর্জ্জমাও চলে গেল। গেল তো গেল-ই—আজও গেল, কালও গেল। খাতাগুলি আর কখনো ফিরিয়ে পেলাম না।

১৯৩১ সনে ফের জেলের পালা সুরু হল। প্রথমে পড়লো হাতে হাতকড়ি লালবাজার বোমার মামলার আসামীরূপে। মামলা ফেঁসে যেতে ডেটিনিউ হ’য়ে বক্‌সা বন্দী নিবাসে কিছুদিন চললো হট্টগোলের ক্যাম্পজীবন। তাপ পরে ‘রাজবন্দীর’ গালভরা নামে অভিহিত হ’য়ে পাঞ্জাবের মিয়ানওয়ালী ও বোম্বের নাসিক জেলে কাটাতে হোলো ছয়টা বছরের উপর উদ্ভিদ জীবনের সুষ্ঠু অনুকরণে। মিয়ানওয়ালী জেলের একান্ত নিরালায় আমার সেই পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি আবার আমায় খোঁচার পরে খোঁচা দিয়ে সজাগ করে তুললো। ভাবলাম—প্রতিশ্রুতি তো রাখতেই চাই। চেষ্টারও ত্রুটি করিনে। একবার খানিকটা, দ্বিতীয় বার অনেকটা এগিয়ে গিয়েও সঙ্কল্পিত কাজটা সম্পূর্ণ করা গেল না। দেখা যাক্ আর একবার চেষ্টা করে’—বার বার তিন বার।

আর কোনো নূতন বই নিয়ে চেষ্টা না করে “প্রিন্‌স্” এর তর্জ্জমাই আবার সুরু করা গেল। অন্যান্য বারে বিষয়টাকে বিশদভাবে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেছি। এবার কিন্তু তর্জ্জমাটা সরল ও যথাসম্ভব মূলের অনুযায়ী রাখাই যুক্তিযুক্ত মনে করেছি ও অন্যান্য বারের মত কেতাবী ভাষায় না লিখে কথ্য ভাষা ব্যবহার করেছি। যেহেতু কথ্য ভাষায় লিখলে তর্জ্জমাটা মূল অনুযায়ী রাখা যত সহজ,

তেমন কেতাবী ভাষায় নয়। আর আমার মতে তর্জ্জমা মূলের হুবহু অনুবাদ হওয়া উচিত—ব্যাখ্যার জন্যে বাড়িয়ে, কিম্বা আকার কমাবার জন্যে ছেঁটেকেটে ছোট করে লেখা অবাঞ্ছনীয়। এতে যদি ভাষা কতকটা অনুবাদগন্ধী হ'য়ে ওঠে, তাতেও কিছু আসে যায় না। পূর্ব্ব বারের মত এবারেও প্রতিদিন এক এক পৃষ্ঠা করে তর্জ্জমা করে প্রায় দু'বছরে সবটা শেষ করা গেল।

এই আমার এ বই লেখার কৈফিয়ৎ। এখনও বাংলা ভাষায় অনুবাদ গ্রন্থ বেশী নেই। অথচ অন্যান্য দেশের সাহিত্যে যে সব মণি-রত্ন ছড়িয়ে রয়েছে তা দিয়ে যে আমাদের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিরও চেষ্টা হওয়া উচিত, এ বিষয়ে মতভেদ নেই। আমার এই কৈফিয়ৎ পড়ে শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকদের ভিতরে একটী যুবকও হয়তো ৺অশ্বিনীকুমারের কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত কর্ম্মপ্রচেষ্টায় লেগে যেতে পারেন এই আশা করেই আমি এই কৈফিয়ৎ লেখায় প্রবৃত্ত হয়েছি।

পরিশেষে যিনি বালক-কালেই আমার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়ে নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতরেও আমার মনে বার বার করে এই বই লেখার প্রবৃত্তি ও উৎসাহ জুগিয়েছেন, সেই মহাবরেণ্য দেশনেতা অশ্বিনীকুমারের পুণ্যনামে আমার বহু পরিশ্রমের এই অকিঞ্চিৎকর পুস্তিকাখানি উৎসর্গ করে আজ আমি কৃত-কৃতার্থ।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬

অনুবাদক

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

কৈফিয়ৎ

প্রথম পরিচ্ছেদ—রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ ও প্রতিষ্ঠা ... ১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—বংশ-পরম্পরা-গত রাজতন্ত্র ... ৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ—মিশ্র রাজতন্ত্র ... ৫
চতুর্থ পরিচ্ছেদ—দরায়ুসের কাছ থেকে আলেক্‌জেণ্ডার যে রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলেন, সেই রাজ্যে আলেক্‌জেণ্ডারের মৃত্যুর পরে বিদ্রোহ না হওয়ার কারণ কি ? ... ২১
পঞ্চম পরিচ্ছেদ—স্বায়ত্ত শাসনে অভ্যস্ত দেশ বা নগর জয় করে সেখানে কিরূপ শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক, সেই সম্বন্ধে আলোচনা ... ২৭
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—স্বকীয় বাহুবল ও নৈপুণ্যে অধিকৃত রাজ্য ... ৩০
সপ্তম পরিচ্ছেদ—অপরের অস্ত্রবলে কিম্বা সৌভাগ্যক্রমে অর্জ্জিত রাজ্য ... ৩৭
অষ্টম পরিচ্ছেদ—শয়তানী করে কেড়ে নিয়ে জুড়ে বসা রাজ্য ... ৫২
নবম পরিচ্ছেদ—পৌর রাষ্ট্র ... ৬১
দশম পরিচ্ছেদ—রাষ্ট্রের শক্তি পরিমাপ করার মানদণ্ড ... ৬৮

বিষয় পৃষ্ঠা
একাদশ পরিচ্ছেদ—ধর্ম্ম যাজকীয় রাজতন্ত্র ... ৭২
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—সৈন্যদের প্রকার-ভেদ ও ভাড়াটে সৈন্য ... ৭৭
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—মিত্র সৈন্য, মিশ্র সৈন্য ও নিজস্ব সৈন্য ... ৮৭
চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ—যুদ্ধকৌশল ও রাজার কর্ত্তব্য ... ৯৫
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ—সুনাম ও দুর্নামের হেতু ... ১০০
ষোড়শ পরিচ্ছেদ—উদারতা ও সঙ্কীর্ণতা ... ১০৩
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ—দয়া ও নির্দ্দয়তা ... ১০৮
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ—বিশ্বাস-রক্ষা ... ১১৪
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ—অবজ্ঞা ও ঘৃণার পাত্র না হওয়া ... ১২০
বিংশ পরিচ্ছেদ—দুর্গ-স্থাপন নিরস্ত্রীকরণ ইত্যাদি ব্যবস্থার উপকারিতা ও অনিষ্টকারিতা ... ১৩৯
একবিংশ পরিচ্ছেদ—সুখ্যাতি লাভের উপায় ... ১৪৮
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ—রাজকর্ম্মচারী ... ১৫৫
ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—চাটুকার ... ১৫৮
চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ—'ইতালীর রাজারা কেন রাজ্যহারা হয়েছেন?' ... ১৬২
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ—দৈব ও পুরুষকার ... ১৬৬
ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ—ওঠো, জাগো,—ইতালীর মুক্তি সাধনে তৎপর হও ... ১৭৩

উৎসর্গ

মহামহিমার্ণব লরেঞ্জো ডি পিয়েরো ডি মেদিচি

রাজা-মহারাজার অনুগ্রহ লাভের আশায় বহু লোক তাঁদের কাছে আসে। তারা বহু মূল্যবান বস্তু উপহার দিতে আনে, যা পেলে রাজারা খুবই খুশী হবেন বলে তাদের বিশ্বাস, কিম্বা যা তারা নিজেরাই বহু মূল্যবান মনে করে। তাই দেখা যায়, এদের কোনো উপহার দিতে হলেই সাজোয়া ঘোড়া, অস্ত্র-শস্ত্র, স্বর্ণ-খচিত বস্ত্র, মণি-মাণিক্য কিম্বা তদনুরূপ অন্য কোনো মূল্যবান বস্তুই লোকে দিয়ে থাকে, যা সত্যিই রাজার যোগ্য উপহার বলে সর্ব্বত্র স্বীকৃত।

হে রাজন্! আমার বড়ই আকাঙ্ক্ষা আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা-ভক্তির যৎ-সামান্য নিদর্শন নিয়ে আপনার কাছে উপস্থিত হই। কিন্তু আমার এমন কি আছে, যা আপনার শ্রেষ্ঠত্বের উপযুক্ত হবে? আমার থাকার মধ্যে আছে খানিকটা জ্ঞান, যা আমি পেয়েছি বর্ত্তমান কালের বৈষয়িক ব্যাপারের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও অতীত ইতিহাসের গভীর অধ্যয়ন থেকে। এই জ্ঞানটুকু ছাড়া আমার আর এমন কিছু নেই, যা আমার কাছে এর চেয়েও বেশী প্রিয়, কিম্বা বেশী মূল্যবান। তাই বহু দিনের বহু পরিশ্রম, বহু ভাবনা চিন্তার ফলে সেই জ্ঞানটুকুকে সাজিয়ে গুছিয়ে যে ক্ষুদ্র গ্রন্থের আকারে গেঁথে তুলেছি, সেই গ্রন্থখানিই আজ আমি আপনার কাছে পাঠাতে উদ্যোগী হয়েছি।

আপনার করে উৎসর্গিত হওয়ার মত গৌরবলাভের যোগ্যতা যদিও আমার এ ক্ষুদ্র গ্রন্থের নেই, তবু যে আমি সাহসী হয়েছি এ ক্ষুদ্র উপহার নিয়ে আপনার সমক্ষে উপস্থিত হতে, সে শুধু আপনার অপার

মহানুভবতার উপরে নির্ভর করেই। আপনি নিজেই তো জানেন যে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু উৎসর্গ করার শক্তিই আমার নেই। বহু বাধা-বিপত্তির ভিতর দিয়ে বহু বছরের চেষ্টার ফলে যে জ্ঞান আমি লাভ করেছি, এই একখানা বই থেকেই আপনি তা অতি অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করতে পারবেন। আপনাকে উৎসর্গ করার মত এর চেয়ে মূল্যবান বস্তু আমার আর কি থাকতে পারে, তা আপনার অজানা নেই। তবে লোকে যেমন করে, তেমন করে আমি কোথাও অনাবশ্যক বাহুল্য দিয়ে ফেনিয়ে ফেনিয়ে এর কলেবর স্ফীত করে তোলা, কিম্বা নানা অলঙ্কারে সাজিয়ে এর চাকচিক্য ও জাঁক-জমক বৃদ্ধি করার প্রয়াস পাইনি। কারণ আমি এইটেই চেয়েছি যে বিষয়ের গুরুত্ব ও খাঁটি সত্যের মর্য্যাদা বুঝে যদি কেউ এর কদর করে, তো করুক, নইলে কোনো প্রয়োজন নেই।

অনেকে মনে করেন যে সাধারণ অবস্থাপন্ন লোকদের পক্ষে রাজ-রাজড়ার বিষয়ে আলোচনা করতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু আমি তাদের সঙ্গে একমত হতে পারিনে। কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র আঁকতে হোলে যেমন সমতল ক্ষেত্রে বসেই, পাহাড়-পর্ব্বতের সংস্থান বুঝে নিতে হয়, অথবা সমতল প্রান্তরের ধারণা করতে হোলে যেমন সমুচ্চ পাহাড়ের উপরেই আসন পেতে বসতে হয়, সেইরূপ রাজা যেমন বুঝবে সাধারণ লোকদের মতি-গতি, অন্যেরা তেমন বুঝবে না। আর সাধারণ লোকেরা যেমন বুঝবে রাজ-রাজড়ার প্রকৃতি ও প্রভাব, অন্য স্তরের লোকেরা তেমন বুঝবে না।

অতএব, হে রাজন, যে বিশ্বাস ও বুদ্ধিতে প্রণোদিত হয়ে আমি এই ক্ষুদ্র উপহার আপনাকে উৎসর্গ করছি, সেইটে বিবেচনা করেই আপনি ইহা গ্রহণ করুন। আপনার সুযোগ-সুবিধা ও নিজস্ব যোগ্যতা যা আছে, তাতে আপনার পক্ষে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা খুবই সহজ ও

স্বাভাবিক। আমারও প্রাণের একান্ত কামনা এই যে আপনি অচিরে এই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়ে উঠুন। যদি আপনি একটু কষ্ট স্বীকার করে এই বইখানা পড়েন ও ভিতরের কথাটা বুঝবার চেষ্টা করেন, তবে দেখতে পাবেন যে, একমাত্র এই আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়েই আমি বইখানা লিখেছি। আপনি যদি কখনো আপনার মহামহিমার উচ্চ শিখর থেকে দয়া করে সমতল প্রদেশের অধিবাসী আমার মত সামান্য লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তবে সহজেই বুঝতে পারবেন,—গ্রহবৈগুণ্যে বহুদিন ধরে আমি যে অকথ্য দুঃখ পাচ্ছি, তা আমার সত্যি প্রাপ্য নয়।

নিকোলো মেকিয়াভেলি

মেকিয়াভেলির রাজনীতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ ও প্রতিষ্ঠা

দেশে দেশে ও যুগে যুগে বিভিন্ন প্রকারের যত শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে, তাদের মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) গণতন্ত্র, ও (২) রাজতন্ত্র।

রকম ভেদে রাজতন্ত্রও আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হোতে পারে—(১) পুরাতন, ও (২) নূতন।

যেখানে রাজবংশ বহুপূর্ব্ব থেকে স্বরু করে বংশ-পরম্পরা ক্রমে দেশের শাসনভার বহন করে আসছে, সেখানকার শাসন-ব্যবস্থাকেই পুরাতন রাজতন্ত্র বলে বুঝতে হবে।

নূতন রাজতন্ত্রও আবার দু' রকমের হ'তে পারে। এক হচ্ছে যা সম্পূর্ণ নূতন; অর্থাৎ রাজ্য ও রাজবংশ—উভয়ই নূতন স্থাপিত হয়েছে।

যেমন সাধারণ অবস্থা থেকে ফ্রান্‌সেস্‌কো স্ফোর্জা (Francesco Sforza) মিলানে নূতন রাজত্ব স্থাপন করে' রাজা হ'য়ে বসেছিলেন। দ্বিতীয় রকমের নূতন রাজতন্ত্র হচ্ছে, যা কোন রাজা কর্তৃক অধিকৃত হয়ে তার বংশপরম্পরা ক্রমে প্রাপ্ত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে—অর্থাৎ যেখানে রাজ্য নূতন হোলেও রাজবংশ নূতন নয়। যেমন স্পেন-রাজের অধীন হওয়ায় নেপেল্‌স্‌-এ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো।

যে সব দেশে এরূপ নূতন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সব দেশ এর আগে হয় স্বাধীন ছিল, নয় অন্য কোন রাজার অধীন ছিল নিশ্চয়। আর এই নূতন রাজতন্ত্রের নূতন রাজা সে দেশ দখল করেছে, নিজেরই পরাক্রমে অথবা অপরের শক্তির সাহায্যে; কিম্বা নানা অনুকূল যোগাযোগের ফলে—এক কথায় ভাগ্যের জোরে। তা ছাড়া আর হ'তে পারে, নিজের অন্য কোনো ক্ষমতা-বলে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বংশ-পরম্পরা-গত রাজতন্ত্র

আমরা এখানে শুধু রাজতন্ত্র সম্বন্ধেই আলোচনা করবো—গণতন্ত্র সম্বন্ধে কোন কথাই চলবে না। অন্যত্র সে সম্বন্ধে আমি যথেষ্টই আলোচনা করেছি।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে পর্য্যায়ে রাজতন্ত্রের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগের উল্লেখ করেছি, সেই পর্য্যায়েই এই গ্রন্থে সে সব বিষয়ের আলোচনা করা হবে। আমার আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, এই সব রকম-রকমারি রাজতন্ত্রের শাসন-কার্য্য কোনটা কি ভাবে চালালে, তা আর কখনো রাজার হাত থেকে ফস্‌কে যাবে না, তার সূত্র বের করা।

একথা সহজেই বোঝা যায় যে, নব স্থাপিত রাজতন্ত্রের চেয়ে দীর্ঘকাল স্থায়ী বংশগত রাজতন্ত্রের শাসন সংরক্ষণ অধিকতর সহজ। অনেক দিন ধরে কোনো প্রাচীন রাজবংশের শাসনাধীনে থেকে, দেশের লোক তাদের শাসনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। সেরূপ ক্ষেত্রে পূর্ব্বপুরুষগণের কায়দা-কানুন মেনে ও অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে' চলতে পারলে যে কোনো সাধারণ ক্ষমতাপন্ন রাজার পক্ষেই তার রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণ অতি সহজ। তবে যদি অত্যধিক ও অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন কোন রাজা তাকে আক্রমণ করে, তাহলে অবশ্যি কি হবে অত সহজে বলা

যায় না। কিন্তু সে ক্ষেত্রে রাজ্য তার হস্তচ্যুত হোলেও, যখনই এই নূতন রাজার কোন বিপদ ঘটবে, চেষ্টা করলে তখনই সে তার হৃত রাজ্য উদ্ধার করতে পারবে।

এর দৃষ্টান্ত খুঁজতেও বেশী দূর যেতে হবে না। এ দেশেরই ফেরারার ডিউক (Duke of Ferrara) দু-দুবার শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে ভেনেসীয়গণ ও ১৫১০ খৃষ্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াস তার সঙ্গে লড়তে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেউ-ই তার বিরুদ্ধে কিছু করে উঠতে পারেন নি। তার একমাত্র কারণই হচ্ছে এই যে, ফেরারার ডিউকের রাজ্য বহু পূর্ব্বেই স্থাপিত হয়েছিল, এবং বহুদিন ধরেই সে রাজ্যের শাসনভার একই রাজবংশের হস্তে ন্যস্ত ছিল। যে রাজা উত্তরাধিকার সূত্রে রাজ্যের মালিক হয়েছে, তার পক্ষে প্রজার অসন্তোষজনক কাজ করার সম্ভাবনা কম, প্রয়োজনও নেই। তাই দেখা যায় যে প্রজারা এরূপ রাজাকেই বেশী ভালবাসে। যদি কোন অনন্য-সাধারণ চরিত্রদোষের ফলে সে রাজা সকলের ঘৃণার পাত্র হয়ে না পড়ে, তাহলে স্বভাবতঃই প্রজারা চিরকাল তার পক্ষপাতী হয়ে থাকবে। তারপরে তার শাসন যতই পুরোনো ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হোয়ে উঠবে, ততই পূর্ব্ব পরিবর্ত্তনের স্মৃতি ও পুনঃ পরিবর্ত্তনের প্রেরণা লোকের মন থেকে লোপ পেতে থাকবে। অন্যথায় সাধারণতঃ এক পরিবর্ত্তন লোকের,মন উন্মুখ করে রাখে আর এক পরিবর্ত্তনের দিকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মিশ্র রাজতন্ত্র

নূতন স্থাপিত রাজতন্ত্রের অসুবিধার অন্ত নেই। প্রথমতঃ যে রাজতন্ত্র সম্পূর্ণ নূতন নয়—যার এক অংশ নূতন ও অপর অংশ পুরাতন বলে' মিশ্র রাজতন্ত্র আখ্যা দেওয়া যেতে পারে, সেরূপ রাজতন্ত্রের বেলাতেও অসুবিধা কিছুমাত্র কম নয়। রাজ পরিবর্ত্তনে তার অবস্থার উন্নতি হবে—এই আশায় মানুষ ইচ্ছা করেই তার জন্যে চেষ্টা করে—এই আশাই তাকে প্রতিষ্ঠিত শাসন-শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে প্রবৃত্ত করে; কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই আশা-কুহকিনী তাদের প্রতারিতই করে। অল্প দিনের মধ্যেই তারা দেখতে পায় যে তাদের অবস্থা যা ছিল, তার চেয়েও খারাপ হয়েছে। অথচ এজন্য নূতন রাজার দোষ দেওয়া চলে না। এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। নূতন রাজা তার সৈন্যদলের ব্যয়ভার ও অন্য নানারকমের বোঝা প্রথমে তাদের উপরে চাপাতেই বাধ্য হয়, যারা সবার আগে স্বেচ্ছায় তার শাসন অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নেয়। তখনকার অবস্থার সাধারণ ও স্বাভাবিক প্রয়োজন বশেই তাকে তা করতে হয়।

নূতন দেশ অধিকার করতে গিয়ে তুমি যাদের ক্ষতি করেছো, তারা তো তোমার মর্ম্মান্তিক শত্রু হয়ে আছেই। অধিকন্তু যেসব বন্ধুরা

তোমাকে সে দেশের রাজ-তক্তে বসিয়েছে, তাদের বন্ধুতা রক্ষা করাও তোমার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। যেহেতু যা হোলে তারা খুসী হোতো, সেরূপ করা তোমার সাধ্যের অতীত। অথচ একটা স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা বুদ্ধির বশে তোমার মনই চাইবে না, তাদের সম্বন্ধে কড়া রকমের কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করতে। তারপরে সৈন্য ও অস্ত্রবলে তুমি যতই শক্তিশালী হও না, নূতন অধিকৃত দেশে সবাইকেই শত্রু করে তোলা বড় সুবিধার কথা নয়—অন্ততঃ এক দল লোকের সদ্ভাব ও শুভেচ্ছা যাতে তোমার দিকে থাকে, তার ব্যবস্থা করা একান্তই প্রয়োজন।

এই সব কারণেই ফরাসী-রাজ দ্বাদশ লুই যেমন তাড়াতাড়ি মিলান অধিকার করেছিলেন, তেমনি তাড়াতাড়িই আবার তা হারিয়েছিলেন। প্রথমবার লোডোভিকো তার সামান্য সৈন্য নিয়েই ফরাসী-রাজকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার কারণ, মিলানের অধিবাসীরা যে উদ্দেশ্যে ফরাসী-রাজকে ডেকে এনেছিলো, সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিফল হয়েছে দেখে, তারা আর তখন তার দুর্ব্যবহার মাথা পেতে সহ্য করতে রাজী ছিল না। তাই তারা ফরাসী-রাজকে তাড়াবার জন্যে নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে লোডোভিকোকে সহরের দুয়ার খুলে দিয়েছিল। একথা খুবই সত্য যে ফরাসী-রাজের দ্বিতীয়বার মিলান অধিকারের পরে আর সহজে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু তার কারণ হচ্ছে এই যে, বিদ্রোহের অজুহতে তিনি অকুণ্ঠচিত্তে, যারা তার সঙ্গে বিশ্বাস রক্ষা করেনি, তাদের যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। যাদের ভবিষ্যৎ ব্যবহার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের কারণ আছে বলে তার মনে হয়েছে, তাদের তিনি দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন এবং দেশের শাসন-সংরক্ষণ ব্যাপারে যেখানে যেটুকু দুর্ব্বলতা ছিল, তার সংশোধনের ব্যবস্থা করলেন। তাই প্রথমবারে লোডোভিকো মিলানের সীমান্তে

শুধু বিদ্রোহ ঘোষণা করেই ফরাসী-রাজকে তাড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয়বারে তাকে তাড়াতে সমস্ত পৃথিবীকে তার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে সকলের সম্মিলিত-শক্তি বলে তার সৈন্য বাহিনীকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে হয়েছিল।

যাই হোক, মোট কথা এই যে দুই দুই বার মিলান অধিকার করেও ফরাসী-রাজ সেখান থেকে তাড়িত হয়েছিলেন। প্রথমবারের কারণ সাধারণ ভাবে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়বারের কারণটা কি, তাই আমরা এখন দেখবো। আমরা দেখবো, কি সঙ্গতি ও সম্বল তার ছিলো এবং সেই সঙ্গতি ও সম্বল নিয়ে তাঁর মত লোকের পক্ষে কি ব্যবস্থা করা উচিত ছিল, অথচ তিনি নিজে তা করেন নি বা করতে পারেন নি।

যে রাজতন্ত্রের এক অংশ পুরাতন ও এক অংশ নূতন, তার উভয় অংশের লোকই হয় এক দেশবাসী ও এক ভাষাভাষী, অথবা তা নয়। যদি তারা এক দেশবাসী ও এক ভাষাভাষী হয়, তাহলে রাজ্যের পুরাতন অংশের মত নূতন অংশেও সে রাজার শাসন অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা করা কিছুমাত্র শক্ত নয়। বিশেষতঃ তার অধীনে আসার অব্যবহিত পূর্ব্বে যদি এই নূতন অংশের লোকেরা গণতন্ত্র শাসন ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে না থাকে, তাহলে তো কথাই নেই। সে ক্ষেত্রে তার শাসন সেখানে চিরস্থায়ী করে তোলা, খুবই সহজ কাজ। শুধু দেখতে হবে—যাতে পুরাতন রাজার বংশে বাতি দিতেও কেউ কোথাও অবশিষ্ট না থাকে।

উভয় অংশেই লোকজনের সাধারণ অবস্থা ও প্রচলিত বিধি ব্যবস্থার কোনো পরিবর্ত্তন না হওয়ায় ও তাদের নিজেদের আচার-ব্যবহারে বিশেষ কোনো পার্থক্য না থাকায়, তারা সহজেই পরস্পর মিলে মিশে

শান্তিতে বসবাস করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে; যেমন আমরা দেখতে পাই ব্রিটানী, বার্গাণ্ডী, গ্যাস্কনী ও নরম্যাণ্ডীতে হয়েছে। সেখানকার অধিবাসীরা সবাই বহুদিন ধরে ফরাসীর শাসন মেনে নিয়ে নির্বিঘ্ন শান্তিতে বসবাস করছে। তাদের ভিতরে ভাষার কিছু কিছু পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের আচার-ব্যবহার একই রকমের বলে অন্যান্য সকলের সঙ্গে বনিবনাও করে চলতে তাদের বাধবে না একটুও। যে রাজা কোন নূতন দেশ অধিকার করে নিজের পুরাতন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন, তিনি যদি এই নূতন দেশে তার শাসন নিরাপদ করে রাখতে চান, তবে তাঁকে দুটি বিষয়ে বিশেষ সাবধান হোতে হবে। প্রথমতঃ সে দেশের পুরাতন রাজাকে সবংশে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ সে দেশের আইন-কানুন ও রাজস্ব নীতি যা ছিল, হুবহু তাই বজায় রাখতে হবে—কোন পরিবর্ত্তন করা চলবে না। এই দুটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখলেই তার রাজ্যের নূতন অংশ সহজেই পুরোণো অংশের সামিল হয়ে যাবে—উভয় অংশের ভিতরে যে কখনো কোনো পার্থক্য ছিল, তা বোঝাই যাবে না।

কিন্তু এমন যদি হয় যে রাজার পুরোণো রাজ্যের সঙ্গে তার নবাধিকৃত রাজ্যের ভাষা, আচার-ব্যবহার, আইন-কানুন প্রভৃতি সব বিষয়েই অমিল, তবে সে ক্ষেত্রে অসুবিধার অন্ত নেই এবং সে দেশে তার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে হোলে, একদিকে যেমন তার শুভাদৃষ্ট থাকা চাই, অপর দিকে তেমনি তার প্রচুর শক্তি-সামর্থ্য ও উদ্যম-উৎসাহ থাকা প্রয়োজন। সে অবস্থায় যদি রাজা নিজে গিয়ে সে দেশে বসবাস করেন, তবে তার ফলে সে দেশে তার শাসন অধিকতর স্থায়ী ও নিরাপদ হোতে পারে। গ্রীসদেশে যে তুর্কীর শাসন এতটা দীর্ঘ স্থায়ী হয়েছে, তার কারণই হচ্ছে এই। সেখানে

গিয়ে বসবাস করা ছাড়া আর কোনো উপায়েই তুর্কীরাজ গ্রীসকে বেশী দিন তাঁর অধীনে রাখতে পারতেন না। কারণ কাছে থাকলে যে কোন গোলমালের সূচনাতেই তার খবর পাওয়া যায় এবং সহজেই তার প্রতিকারের ব্যবস্থা হোতে পারে। কিন্তু দূরে থাকলে, গণ্ডগোলের খবর পৌঁছাতে-ই হোয়ে যায় অনেক দেরী এবং শেষে যখন এসে পৌঁছায়, তখন প্রতিকারের আর কোন উপায় থাকে না। তা ছাড়া, রাজা সামনে থাকলে, কর্ম্মচারীদের অত্যাচার ও লুট-পাট বন্ধ থাকে; যে কোন অভিযোগের প্রতিকারের জন্যে সহজেই রাজার নিকটে নালিশ জানাতে পারে বলে প্রজারাও খুসী থাকে। মোটামুটি তাদের যদি কোনো কু-মতলব না থাকে, তবে যোগাযোগ এমনি হ'য়ে উঠবে, যার ফলে তারা রাজার অনুরক্ত হ'য়ে পড়বে। আর দুষ্টামীর মতলব মনে থাকলেও রাজা নিকটে আছে বলে, তারা ভয়ে ভয়ে থাকতে বাধ্য হবে। তারপরে বাইরে থেকে যদি কেউ সে দেশ আক্রমণ করতে আসে, সে ক্ষেত্রেও সে লোককে অনেক বিবেচনা করে ও অতিশয় সতর্কতা অবলম্বন করে, তবে তা করতে হবে এবং তা করেও, দেশ জয় সম্বন্ধে সুবিধা করে' উঠতে পারবে না, যতদিন সে দেশের রাজা দেশেই বসবাস করতে থাকবেন।

আর এক কাজ করা যেতে পারে, যার ফল আরো ভাল হবে। তা হচ্ছে নূতন দেশে দু' এক স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করা। এমন সব জায়গা বেছে বের করতে হবে, যে সব জায়গাকে সে দেশের চাবি বা প্রবেশ পথ বলা যেতে পারে। নূতন দেশে তোমার শাসন কর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে হোলে, হয় তোমাকে এইরূপ উপনিবেশ বসাতে হবে, নয় অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য বহু পরিমাণে সে দেশে রাখতে হবে। কিন্তু সৈন্য রাখা বহু ব্যয়-সাধ্য ব্যাপার কিন্তু উপনিবেশ বসাতে রাজার

নিজের বিশেষ কোনো খরচ নেই। খরচ যদি কিছু হয়ও তবে তা নিতান্তই যৎসামান্য, অনেক সময়ে ঔপনিবেশিকরা নিজেদের পকেট থেকেই তা বহন করে' থাকে। তার পরে, উপনিবেশ স্থাপন সে দেশের জন-সাধারণেরও বিশেষ অসন্তোষের কারণ হয় না। কেননা, যাদের জমি-জমা, বাড়ী ঘর কেড়ে নিয়ে এই নবাগতদের দিতে হবে, তারা সংখ্যায় আর ক'জন?—নিতান্তই মুষ্টিমেয় এবং নিতান্ত নিঃস্ব হয়ে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয় বলে রাজার কোনো অনিষ্ট করা তাদের শক্তিতেই কুলোয় না। এরা ছাড়া আর সকলে সহজেই চুপ করে থাকবে, তাদের তখনও কোন ক্ষতি হয়নি বলে এবং পাছে কখনো বে-চালে পা ফেললে, ওদেরি মত তাদেরও দুর্দ্দশার একশেষ হয়—এই ভয়ে সর্ব্বদা সাবধান হয়ে চলবে। মোট কথা, উপনিবেশ স্থাপনে ব্যয় কম হয়, ঔপনিবেশিকগণ বিশ্বাসী বেশী হয়, স্থানীয় লোকের ক্ষতি কম হয়, এবং যাদের ক্ষতি হয়, তারাও গরীব হয়ে যায় ও এক স্থানে এক সঙ্গে থাকতে পারে না বলে' রাজার কোনো অনিষ্ট সাধন করতে পারে না। এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে মানুষের সঙ্গে হয় ভাল ব্যবহার করবে, নয় তাকে পিষে মারবে। ক্ষতির পরিমাণ যদি সামান্য হয়, তবে প্রতিশোধ নেওয়া সহজ, কিন্তু সাংঘাতিক ক্ষতির প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভবপর হয় না। কাজেই কারো ক্ষতি করা যদি একান্ত অনিবার্য্য হয়েই পড়ে, তবে তার এমন সর্ব্বনাশ করবে যেন আর কখনো সে তোমার আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠতে না পারে।

নবাধিকৃত দেশে উপনিবেশ স্থাপনের চেয়ে সশস্ত্র সৈন্য রাখার খরচ অনেক বেশী। সে দেশের রাজস্ব থেকে যা আয় হবে, সবই

সৈন্যের পিছনে খরচ হয়ে যাবে। ফলে সে দেশে রাজত্ব করা লোকসানের ব্যবসা হয়ে দাঁড়াবে। সৈন্য রাখার ফলে সে দেশের সব লোকেরই কম বেশী ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। তাই উপনিবেশ স্থাপন যে কয়জন লোকের অসন্তোষের কারণ হবে, তার চেয়ে ঢের বেশী লোক অসন্তুষ্ট হবে সৈন্য সংস্থাপনের ফলে। তারপরে, সৈন্যদের এক সৈন্যাবাস থেকে আর এক সৈন্যাবাসে যাতায়াতের দরুণ সকলেরই অনিষ্ট হবে এবং কম বেশী সকলেই দুঃখের স্বাদ পাবে ; ফলে সকলেই শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। এবং তারা এমন শত্রু যে, নিজের দেশেই পরাজিত বিধ্বস্ত হয়েও রাজার অনিষ্ট সাধনে সক্ষম। কাজেই যে দিক দিয়েই দেখিনে কেন, সৈন্য সংস্থাপনের চেয়ে উপনিবেশ স্থাপনের সুবিধা ও কার্য্যকারিতা অনেক বেশী।

তারপরে যিনি এইরূপ ভিন্ন ভাষাভাষী ও ভিন্ন আচার ব্যবহারে অভ্যস্ত কোনো নূতন দেশ জয় করে নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন, তাঁর কর্ত্তব্য এই নূতন দেশে তাঁর প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা ক্ষুদ্রশক্তি ও দুর্ব্বল, অবিলম্বে তাঁদের নেতৃত্ব ও রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং যারা অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী, তাদের শক্তিক্ষয়ের চেষ্টা করা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সব সময়ে সাবধান থাকতে হবে, যেন তাঁর নিজের মত ক্ষমতাশালী অন্য কোনো বিদেশী রাজশক্তি দৈবাং কোনো সুযোগে সে দেশে পা ফেলবার জায়গাটুকুও করে নিতে না পারে। কারণ সব সময়ে এরূপই ঘটতে দেখা যায় যে দেশের যারা—উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশেই হোক, কি ভয়েই হোক—প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট, তারাই দেশের মধ্যে অন্য কোন বহিঃশক্তিকে ডেকে আনে। এর দৃষ্টান্ত তো কতই দেখেছি। ইটালিয়ানরা গ্রীসদেশে রোমানদের ডেকে এনেছিলো। অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্তও এই এক কথাই বলে যে

দেশের লোকরাই বিদেশীকে ডেকে এনে জায়গা করে দেয়। ঘটনা সাধারণতঃ এই ভাবে ঘটে—প্রতাপশালী কোন বিদেশী শক্তি যেমনি কোনো দেশে এসে পদার্পণ করে, অমনি সেই দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধীন রাষ্ট্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষে উদ্বুদ্ধ হয়ে, নবাগত বিদেশী শক্তির পতাকাতলে এসে জোটে। ফলে সে দেশের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে নবাগতের পক্ষে তার নিজের দলে টেনে আনতে কোন বেগ পেতে হয় না—তার অধিকারের ভিতরে, তার আশ্রয়ে, তারা আপনি এসে জোটে। তার শুধু খেয়াল রাখতে হবে, যেন ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব অত্যধিক মাত্রায় তাদের হাতে গিয়ে না পড়ে। তাহলেই তার নিজের শক্তিবলে ও এদের সাহায্য ও শুভেচ্ছায় অনায়াসেই অপেক্ষাকৃত বৃহৎ রাষ্ট্রগুলিকে দমিয়ে রেখে তিনি সে দেশের অধিনায়ক ও প্রভু হয়ে বসতে পারবেন। যিনি এই ব্যবস্থাগুলি ঠিক ঠিক মত করতে না পারবেন, তার নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা তো দূরের কথা, তিনি সে দেশে যা অধিকার করেছেন, তা-ও হারাবেন এবং যে ক'দিন রাখতে পারবেন, সে ক'দিনও, হাঙ্গামা ও ঝঞ্ঝাটের সীমা থাকবে না।

রোমানরা যে কোনো দেশ অধিকার করতো, সেখানেই এই নিয়মগুলি মেনে চলতো। তারা সেদেশে উপনিবেশ বসাতো; ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির শক্তি না বাড়িয়ে তাদের হাতে রেখে চলতো; অপেক্ষাকৃত বড় রাষ্ট্রগুলিকে শাসনে রাখতো এবং কোনো প্রতাপশালী বিদেশী রাজশক্তি যাতে সেদেশে পাত্তা না পায়, সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতো। এ সম্বন্ধে গ্রীসের দৃষ্টান্ত দেখানই যথেষ্ট। রোমানরা সেখানে অ্যাকিয়ান্ ও ইটোলিয়ানদিগকে বন্ধু করে রেখেছিলো, ম্যাসিডোনিয়ান্ রাজ্যটাকে জব্দ করে রেখেছিলো এবং এণ্টিয়োকাসকে দেশ ছাড়া করে

দিয়েছিলো। অথচ অ্যাকিয়ান্ ও ইটোলিয়ানদের বন্ধুত্ব কখনো তাদের শক্তি বাড়াবার অনুমতি আদায় করতে পারে নি। প্রথমে একবার বিশেষ ভাবে জব্দ না করে, শত অনুরোধ-উপরোধেও ফিলিপকে তারা বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নি। রোমানদের কাছে এন্টিয়োকাসের প্রভাব-প্রতিপত্তি যথেষ্টই ছিল। তবু কিন্তু দেশে তার প্রভুত্ব বাড়াবার কোনো ব্যবস্থায়ই সে রোমানদের রাজি করাতে পারে নি। যে কোনো বুদ্ধিমান বিবেচক লোক এসব ক্ষেত্রে যা করে থাকে, রোমানরাও তাই করেছে। কারণ, বর্ত্তমান ঝঞ্ঝাটের প্রতিবিধান করাই যথেষ্ট নয়,—ভবিষ্যতে যা আসছে, তার জন্যেও আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রাখতে হয়। বিশেষ করে ভবিষ্যৎ বিপদের জন্যেই বেশী সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কারণ দূরদৃষ্টির সাহায্যে আগে হতে ভবিষ্যৎ অনুমান করতে পারলে যে কোন বিপদের প্রতিবিধান অতি সহজ। কিন্তু বিপদ একবার ঘাড়ের উপর এসে পড়লে, সময়কালে ঔষধ দেওয়া হয়নি বলে, রোগ তখন শিবের অসাধ্য হয়ে পড়ে। বিলেতী যক্ষ্মাজর সম্বন্ধে চিকিৎসকগণ যা বলেন, এ-ও তেমনি! সূচনাতে এ রোগে চিকিৎসা সহজ; কিন্তু রোগনির্ণয় কঠিন। গোড়ায়ত রোগ ধরা পড়ে না, চিকিৎসাও হয় না। শেষে অবস্থা এমনি দাঁড়িয়ে যায় যে রোগ ধরা তখন অতি সহজ, কিন্তু সারানো কঠিন। রাজ্য-শাসন ব্যাপারেও এই রূপই ঘটে। অমঙ্গল, যা আসছে, আগে থেকেই যদি তার উদ্দেশ পাওয়া যায়,—যা শুধু দূরদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব,—তবে সহজেই তার প্রতিকার হোতে পারে। তাই ভবিষ্যৎ ঝঞ্ঝাটের সম্ভাবনা বুঝতে পেরে, রোমানরা তৎক্ষণাৎ তার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করেছিলো। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে না চাইলে, হয়তো তখন তারা যুদ্ধ না করেও পারতো। কিন্তু তাতে তারা রাজি হয়নি। যেহেতু, তারা জানতো যে শেষ পর্য্যন্ত

যুদ্ধ এড়ানো যায় না, শুধু কিছুদিনের জন্যে মুলতবি রাখা যেতে পারে মাত্র। কিন্তু তার ফলে হয়তো এমন সময় যুদ্ধ বাধবে, যখন সুবিধা যোল আনাই প্রতিপক্ষের অনুকূলে। তাতে যুদ্ধ মুলতুবি রেখে শত্রুপক্ষেরই সুবিধা করে দেওয়া হয় মাত্র। আর এক কথা, ফিলিপ ও আন্টিয়োকাসের সঙ্গে তাদের যে লড়াই হয়েছিলো, তা গ্রীস দেশেই হয়েছিল। তখন যদি তারা যুদ্ধ না করতো, তবে হয়তো সেই যুদ্ধই তাদের করতে হতো পরে তাদের নিজেদের দেশের বুকের উপরে—ইটালীতে। কিন্তু সেরূপ অবস্থা ঘটতে দিতে তারা রাজি ছিল না। এমনো হয়তো হোতে পারতো, যে দু'জায়গার এক জায়গায়ও যুদ্ধ হোলোনা, কিন্তু তারা তা-ও চায়নি। আজকাল অনেক বুদ্ধিমান লোকের মুখেও শোনা যায়—বর্ত্তমান যা হাতে এনে পৌঁছে দেয়, তাকে প্রত্যাখ্যান করো না—তা-ই নিয়ে সুখী হও। এ কথা রোমানরা কোন দিন মানে নি। বরং তারা চাইতো সময়ের দানকে অগ্রাহ্য করেও, নিজেদের বীর্য্য ও বুদ্ধি বলে যা পাওয়া যায়, তা নিয়ে খুসী থাকতে। কারণ সময় কারো মুখ চেয়ে চলে না—তার দান ভালো মন্দ দুই-ই হোতে পারে।

এখন আবার ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত ধরা যাক এবং দেখা যাক্, যে সব সতর্ক ব্যবস্থার কথা বলা হোলো, তার মধ্যে কতগুলি ও কোনগুলি তারা মেনে চলেছিলো। চার্লসের কথা বাদ দিয়ে আমরা লুইর কথাই বলবো। লুই-ই সবচেয়ে বেশীদিন ইটালীর কোনো না কোনো অংশে রাজত্ব করেছেন বলে, তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করাই ভালো হবে। কিন্তু এই আলোচনার ফলে আমরা এখনি দেখতে পাবো যে সেরূপ মিশ্র রাজতন্ত্রে রাজার শাসন অক্ষুণ্ণ রাখতে হোলে যে সব উপায় অবলম্বন করা উচিত, তিনি ঠিক তার উল্‌টোটাই করেছিলেন।

ভেনেসিয়ানরা রাজা লুইকে এদেশে ডেকে এনেছিলো। তারা

আশা করেছিলো যে, তাঁর হস্তক্ষেপের ফলে তারা লম্বাডির অর্দ্ধেকটা পেয়ে যাবে। তাদের কথামত ফরাসী-রাজ যা করেছেন, তার জন্যে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। ফরাসী-রাজের এদেশে তখন কেউ বন্ধু ছিল না। বিশেষতঃ চার্লসের কাজ-কারবারের ফলে এদেশের সকল দুয়ারই তার কাছে রুদ্ধ। এমত অবস্থায় এদেশে তার দাঁড়াবার একটুখানি জায়গা করে নিতে হোলে, যাকে পাওয়া যায় তারই বন্ধুত্ব গ্রহণ করা তার পক্ষে স্বাভাবিক এবং তিনি করেছেন-ও তাই। অন্যান্য ব্যাপারে তিনি যদি মারাত্মক ভুল না করতেন, তাহলে সহজেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারতো। ফরাসী-রাজ লুই প্রথমে লম্বাডি দখল করলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি সমস্ত প্রভাব-প্রতিপত্তি পুরোপুরিই ফিরে পেলেন, যা চার্লস তার কাজের ভুলে হারিয়েছিলেন। জেনোয়া তার কাছে নতি স্বীকার করলো। ফ্লোরেন্স বন্ধু হয়ে গেলো। মান্তুয়ার মার্কুইস, ফেরেরা ও বেণ্টিভোগলির, ডিউক, ফর্লির রাণী, ফায়েঞ্জা, পিছারো, রিমিনি, কামেরিনো ও পিয়োম্বিনোর রাষ্ট্রপতিগণ এবং লুফিজরা, পিসানিয়ানরা ও সিয়েনিজরা—সকলেই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলো। তখন ভেনেসিয়ানরা বুঝতে পারলো যে হটকারিতার বশে তারা কি ভুল করে বসেছে। তার দেখলো লম্বাডির দুটা সহরের মালিক হওয়ার আশায় তারা ফরাসী রাজকে ডেকে এনে, এখন তাকে সমস্ত ইটালীর দুই-তৃতীয়াংশের উপরে প্রভুত্ব করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

এরূপ অবস্থায় ফরাসী-রাজ যদি পূর্বোল্লিখিত নিয়মগুলি মেনে চলতেন, এবং তার বন্ধুদের আপদে বিপদে আশ্রয় দিয়ে তাদের বন্ধুত্ব রক্ষার চেষ্টা করতেন, তাহলে অনায়াসেই তিনি এদেশে তার প্রভুত্ব বজায় রাখতে পারতেন।

সংখ্যায় তারা বহু হোলেও, সকলেই দুর্ব্বল এবং ভীরু ছিল। কেউ ভয় করতো পোপকে, কেউ ভেনেসিয়ানগণকে। কাজেই তারা সকলেই ফরাসী রাজের সঙ্গে এক সঙ্গে কাঁধ দিয়ে চলতে বাধ্য থাকতো এবং তার ফলে তিনিও এদের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তিশালীদের জব্দ রেখে এদেশে নিজের আসন নিরাপদ রাখতে পারতেন। কিন্তু তিনি মিলানে এসেই পোপকে সাহায্য করলেন রোমাগ্‌ণা অধিকার করতে, যা তার কখনই করা উচিত ছিল না। একথা একবারও তার মনে হোলোনা যে তিনি এই কাজের ফলে নিজেরই ক্ষতি করছেন—যারা বন্ধু, তাদের শত্রু করছেন—যারা তাঁর সাহায্য-প্রার্থী হয়ে তাঁর চারিদিক ঘিরে দাঁড়িয়েছিলো, তাদের আশা ভঙ্গ করে দূর করে দিচ্ছেন। অথচ রোমাগ্‌না পোপের হাতে তুলে দেওয়ার ফলে লাভ হলো এই যে পোপের অপরিসীম অপাথিব নৈতিক প্রভাবের সঙ্গে তাঁর পাথিব শক্তিও অনেকটা বেড়ে গেলো। যে আগেই বড় ছিলো, তাঁকে অনর্থক আরো বড় করে দেওয়া হোলো। গোড়াতেই ভুল করে আর তার ফ্রিরবার উপায় ছিল না—সেই পথেই আরো এগিয়ে যেতে হোলো। ক্রমে ব্যাপার এতদূর গড়ালো যে পোপকে থামাতে—তাকে টাস্কানী অধিকারের প্রচেষ্টা থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে ফরাসী-রাজ স্বয়ং ইতালীতে এসে উপস্থিত হোতে বাধ্য হলেন।

পোপের শক্তি বৃদ্ধি করে ও নিজের বন্ধুদের শত্রু বানিয়ে তিনি যে ভুল করলেন তা-ও যেন যথেষ্ট হয় নি—তাই তিনি স্পেন-রাজকে ডেকে এনে উভয়ে মিলে নেপল্‌স্ রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলেন। এতদিন যেখানে তিনি নিজেই ইতালীর একমাত্র ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন, সেইখানে এখন তিনি আর একজন অংশীদার জোটালেন। তার ফল হোলো এই যে ইতালীর যারা উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভাগ্যান্বেষী এবং

তার নিজের দেশের যারা তার প্রতি অসন্তুষ্ট, হাতের কাছেই তাদের আশ্রয়স্থল জুটিয়ে দেওয়া হোলো। নেপ্‌ল্‌স্‌-রাজকে তিনি নিজের বৃত্তিভোগী করে রাখতে পারতেন; তাতে দেশে তার প্রভুত্বই অপ্রতিহত হয়ে থাকতো। কিন্তু তা না করে তিনি নেপ্‌ল্‌স্‌-রাজাকে তাড়িয়ে দিয়ে এমন একজনকে এনে বসালেন, যার তাঁকে তাড়িয়ে দেবার ক্ষমতারও অভাব ছিল না।

পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মানুষের অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সাধারণ। এজন্য তাকে দোষ দেওয়া যায় না—বরং বহু মান পাওয়ারই যোগ্য সে। কিন্তু যখন সে পাওয়াটা আয়ত্তে আনার শক্তি নেই,—অথচ যে কোন উপায়েই তা লাভ করার দারুণ আকাঙ্ক্ষা চেপে বসে, তখনই সেটা দোষের হ'য়ে ওঠে। নিজের শক্তিতে নেপ্‌ল্‌স্‌ অধিকার যদি ফ্রান্সের পক্ষে সম্ভব হোতো, তবে তাই করা উচিত ছিল। কিন্তু সে সম্ভাবনা যখন ছিল না, তখন আর এক জনের সঙ্গে নেপ্‌ল্‌স্‌ ভাগাভাগি করে পেতে যাওয়াটা তার অন্যায় হয়েছে। ভেনেসিয়ান্‌দের সঙ্গে লম্বার্ডি ভাগ করে নেওয়াটা সমর্থন করা যায় এই বলে যে সেই সুযোগে তিনি ইতালীতে প্রথম দাঁড়াবার জায়গা করে নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু নেপ্‌ল্‌স্‌কে দুই ভাগে ভাগ করা সেরূপ কোনো জরুরী প্রয়োজনের অজুহাত না থাকায় তা অত্যন্ত দূষনীয় হয়েছে।

অতএব লুই ইতালীতে রাজ্য স্থাপন করতে এসে পাচ পাঁচটা ভুল করেছেন। প্রথমতঃ, তিনি ক্ষুদ্র শক্তিগুলির উচ্ছেদ সাধন করেছেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি দেশের অধিকতর ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধির সাহায্য করেছেন। তৃতীয়তঃ তিনি আর একটি ক্ষমতাশালী বিদেশী শক্তিকে দেশে ডেকে আনেন। চতুর্থতঃ তিনি নিজে এসে ইতালীতে বসবাস করেন নি। পঞ্চমতঃ তিনি এদেশে উপনিবেশ বসাবারও

কোনো ব্যবস্থা করেন নি। তিনি নিজে বেঁচে থাকলে, শুধু এই সব ভুলে তার কোন ক্ষতি হোতো না। কিন্তু তিনি এর উপরেও আর একটা প্রকাণ্ড ভুল করলেন। সেটা হচ্ছে, ভেনেসিয়ানদিগকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে পোপকে দিয়ে দেওয়া; তিনি যদি পোপকে রাজ্য বাড়াতে না দিতেন এবং স্পেনকে ইতালীতে ডেকে না আনতেন, তাহলে তার পক্ষে ভেনেসিয়ানদের ক্ষমতা খর্ব্ব করে দেওয়া কিছুমাত্র দোষের হোতো না। বরং সে ক্ষেত্রে সে রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করাই উচিত হোতো।

কিন্তু পোপ ও স্পেনের সম্পর্কে তিনি যে ভুল করেছেন, তার পর আর ভেনিসিয়ানদের ক্ষতি করতে রাজী হওয়া তাঁর উচিত হয় নাই। তারা নিজেরা শক্তিমান বলে নূতন কেউ কোন মতলবই লম্বাডিতে খাটাতে পারতো না—তা ঠেকিয়ে রাখবার ক্ষমতা ভেনেসিয়ানদের নিজেদেরই ছিল। লম্বাডি সম্বন্ধে বর্ত্তমান ব্যবস্থার কোনো পরিবর্ত্তনেই তারা রাজি হোতো না। রাজি হোতো, শুধু যদি তার ফলে তারা নিজেরাই সমস্ত লম্বাডির মালিক হতে পারতো; এবং অন্য এমন কেউই ছিল না, যে ফ্রান্সের কাছ থেকে লম্বাডি কেড়ে নিয়ে পরে তা আবার ভেনেসিয়ানদের দান করে দিয়ে চলে যাবে। আর ফ্রান্স ও ভেনেসিয়ানদের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কেউ যে লম্বাডি অধিকার করতে আসবে—এমন বুকের পাটাও কারো ছিল না।

কেউ হয়তো বলবেন যে পোপ আলেকজেণ্ডারকে রোমাগ্‌না ও স্পেন-রাজকে নেপ্‌লস্‌-এর অংশ বিশেষ অধিকার করতে না দিলে লড়াই বাঁধতো এবং লড়াই এড়াবার জন্যেই লুই তাতে সায় দিয়েছিলেন। আমার জবাব এই যে, লড়াই এড়াতে গিয়ে এমন মারাত্মক ভুল কখনো সমর্থন যোগ্য হোতে পারে না। কেননা, যুদ্ধ শেষ পর্য্যন্ত কখনই

এড়ানো যায় না। লাভের মধ্যে হয় এই যে, পরে যখন তোমার অসুবিধা, তখন তুমি যুদ্ধ করতে বাধ্য হবে। কেন যে এমনটা হয়, তা পূর্ব্বেই বলেছি। কেউ হয়তো একথাও বলতে পারেন যে ফরাসী রাজ পোপের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন তাঁর নূতন রাজ্য-জয়ে সাহায্য করবেন বলে। পোপ তাঁর বিবাহ-বন্ধন ছেদনের অনুমতি দিয়াছিলেন ও তাঁর কথামত জর্জ্জ দি আম্ব্রোয়াজকে রুয়ার আর্চ্চ-বিশপ করেছিলেন। তার পরিবর্ত্তে ফরাসী-রাজও তাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এ কথার জবাব আমি একটু পরেই দিয়েছি। যেখানে রাজ-প্রতিশ্রুতি ও তা কেমন করে রক্ষা করতে হয়, সেই সম্বন্ধে লিখেছি, সেখানেই পাওয়া যাবে।

অতএব ফরাসী-রাজ দ্বাদশ লুই যে লম্বার্ডি জয় করেও তা হারিয়েছিলেন, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে, এইরূপ রাজ্য জয় করে যারা তা রাখতে চায়, তাদের যে সব নিয়ম মেনে চলা উচিত, তা তিনি একটাও মানেন নি। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই—বরং এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত। পোপ আলেকজেণ্ডারের পুত্র সিজার বর্জিয়া (Cesare Borgia)—যাকে লোকে ভেলেন্টিনো বলেই জানে—তিনি যখন রোমাগ্‌না অধিকার করে' সেখানে অবস্থান করছিলেন, তখন একদিন নান্টিসে বসে কার্ডিনাল রোহার সঙ্গে আমার এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। তিনি কথায় কথায় আমায় বললেন যে ইতালিয়ানরা যুদ্ধ বোঝে না। আমি তার উত্তরে বললাম—"ফরাসীরা কিন্তু রাষ্ট্রনীতি বোঝে না"। আমি এই কথাই বলতে চেয়েছিলাম যে, তা যদি না হবে, তা হলে ফরাসীরা কখনই পোপকে এতটা বড় হোতে দিত না। একথা খুবই সত্যি যে ফরাসী-রাজই পোপ ও স্পেনকে ইতালীতে শক্তিশালী করে দিয়েছেন

এবং তার ধ্বংসের মূলেও তাদের প্রভাবই কার্য্য করেছে অনেকখানি। এ থেকে এক সাধারণ সূত্র বের করা যায়, যা কোন অবস্থাতেই মিথ্যা হবে না, কিম্বা হোলেও ক্বচিৎ কদাচিৎ। সূত্রটা এই :—যে লোক অপরের শক্তিশালী হওয়ার কারণ, তার ধ্বংস সেই অপর ব্যক্তিটির হাতেই অনিবার্য্য। কেন না, যে একজনকে বড় করে, সে তা করে তার নিজের শক্তিবলে কিম্বা তার অসাধারণ ক্ষুরধার বুদ্ধি খাটিয়ে এবং এই জন্যেই তার সাহায্যে যে বড় হবে, সে কখনো তাকে বিশ্বাস করতে পারে না।

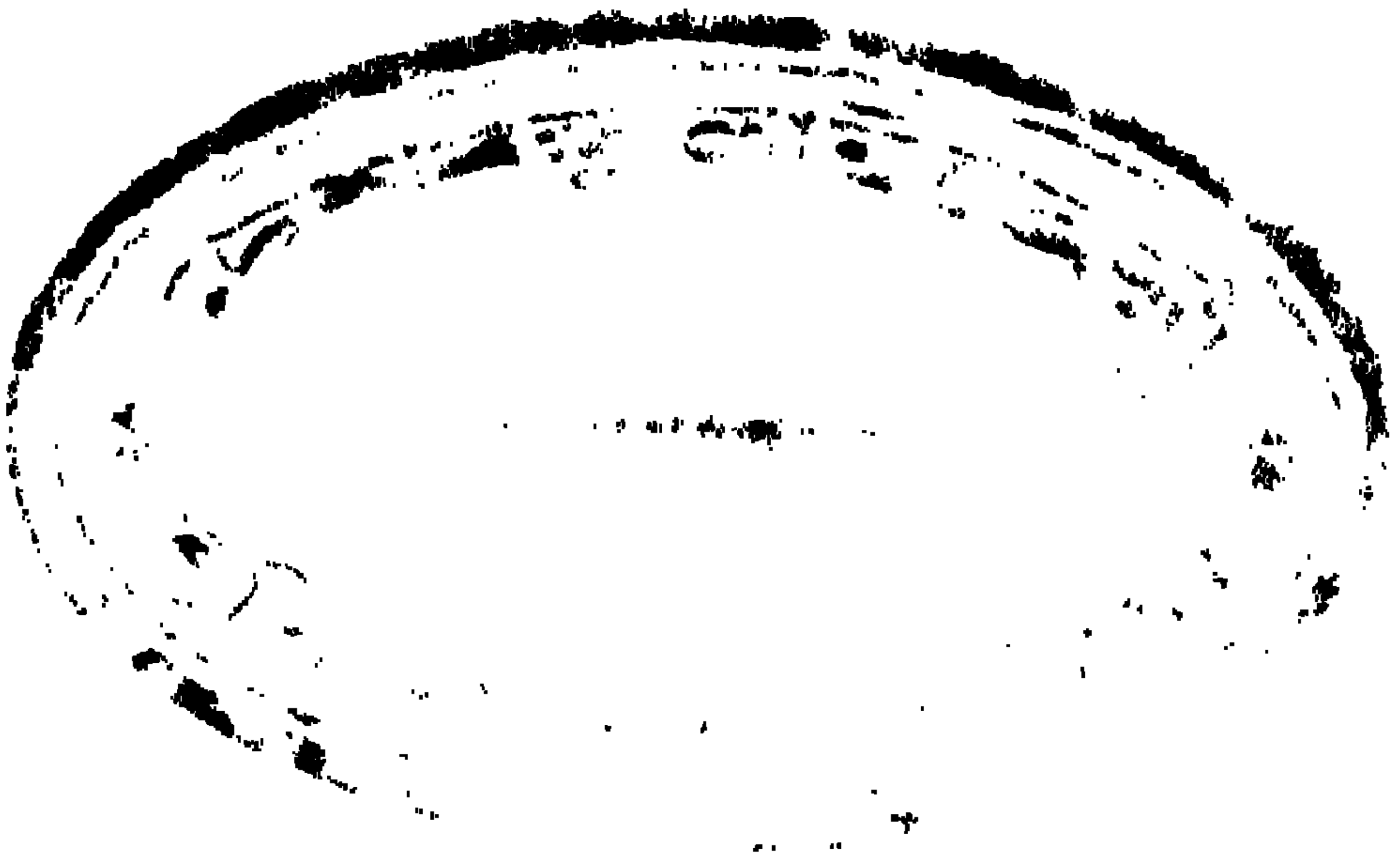

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দরায়ুসের কাছ থেকে আলেক্জেণ্ডার যে রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলেন, সেই রাজ্যে আলেক্জেণ্ডারের মৃত্যুর পরে বিদ্রোহ না হওয়ার কারণ কি?

নূতন রাজ্য জয় করে, তা হাতে রাখা যে কি শক্ত ব্যাপার, তা আমরা জানি। আলেকজেণ্ডার সামান্য কয়েক বছরের ভিতরেই এসিয়ার মালিক হয়েছিলেন এবং সর্ব্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের পূর্ব্বেই তিনি মারা গিয়েছিলেন; তখনই কেন যে সর্ব্বত্র বিদ্রোহ হয়নি, তাই আশ্চর্য্য! একটা বিরাট বিদ্রোহের সম্ভাবনা যে খুবই ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। যারা তার উত্তরাধিকারী হয়ে দাঁড়ালো, তাদের নিজেদের ভিতরে ক্ষমতা নিয়ে লেগে গেলো ঝগড়া-ঝাটি। তবে এইটে ছাড়া বাইরের লোকের কাছ থেকে কোথাও বিশেষ কোন বেগ পেতে হয়নি।

কিন্তু আশ্চর্য্য মনে হলেও, এতে অলৌকিকত্ব কিছু নেই। যে সব রাজ্যের বিবরণ কোনো ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা থেকে দেখা যায় যে, রাজ্য দুই রকমে শাসিত হয়। এক, রাজা নিজেই শাসন করেন একদল কর্ম্মচারীর সাহায্যে। কর্ম্মচারীরা তার অমাত্য হিসাবে

কাজ করেন এবং সব কাজ কর্ম্মে তারই অনুগ্রহ ও অনুমতির উপর নির্ভর করে চলেন। দ্বিতীয়তঃ, রাজা অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলে দেশ শাসন করেন। সেখানে অভিজাত সম্প্রদায় আপন আপন প্রাচীন বংশগত অধিকারের দাবীতেই ক্ষমতার মালিক হন—সে জন্যে তাদের আর রাজার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করতে হয় না। এই অভিজাত-সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বা জমিদারীর মালিক এবং তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব প্রজা আছে, যারা তাদেরই প্রভু বলে মানে ও তাদের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক শ্রদ্ধা-ভালবাসার সম্পর্কে আবদ্ধ। যে রাজ্য রাজা ও তাঁর কর্ম্মচারীদেরদ্বারা শাসিত, সে রাজ্যের প্রজারা রাজার প্রতি বেশী অনুরক্ত হোয়ে থাকে। কারণ সে রাজ্যের প্রজারা তাঁর চেয়ে আর কাউকেই বড় বলে মনে করে না এবং যদি অন্য কারুর কাছে কখনো নতি স্বীকার করে, তবে তাও রাজার অমাত্য বা কর্ম্মচারী হিসাবেই করে - তার সঙ্গে তাদের বিশেষ কোন অনুরাগের সম্পর্ক কখনই হো'য়ে ওঠে না।

এই দুই রকম রাষ্ট্রের উদাহরণ বর্ত্তমান যুগে তুর্কী ও ফ্রান্স। সমস্ত তুর্কী সাম্রাজ্যে বাদশাই সর্ব্বময় কর্ত্তা—আর সবাই তার কর্ম্মচারী। তিনি সাম্রাজ্যটাকে কতকগুলি বিভাগে বিভক্ত করে, প্রত্যেক বিভাগের জন্যে এক একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। তাদের নিয়োগ, বদলী, বরখাস্ত—সবাই তাঁর ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে। কিন্তু ফরাসী-রাজের অবস্থা সেরূপ নহে। দেশের শাসন-কর্ত্তৃত্ব তাঁর একার একচেটিয়া নয়। অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে ভাগ করে তার ক্ষমতা খাটাতে হয়। এই অভিজাত সম্প্রদায় বহুদিন থেকে বংশপরম্পরাক্রমে তাদের ক্ষমতা পরিচালন করে আসছে। তাদের নিজেদের প্রজা আছে,যারা তাদের শাসন বহুদিন থেকেই মেনে নিয়েছে এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসার বন্ধনে

আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। নিজেদের স্বত্ব-স্বামীত্বের দাবীতেই তারা তাদের শাসন পরিচালনা করে। সে স্বত্ব-স্বামীত্ব রাজার কাছে থেকে পাওয়া নয়, রাজা তা কেড়ে নিতেও পারেন না—অন্ততঃ কেড়ে নিতে গেলে তাঁর সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। অতএব এই দুই প্রকারের রাষ্ট্রের সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা করে দেখলে সহজেই বোঝা যাবে যে তুর্কী রাজ্যের মত রাজ্য জয় করা খুব শক্ত, কিন্তু একবার জয় করিতে পারলে সেখানে শাসন কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন রাখা অতিশয় সহজ। যদি কেউ তুর্কী রাজ্য জয় করতে চায়, তবে তার অসুবিধা হচ্ছে এই যে সেখানে এমন কোন অভিজাত সম্প্রদায় নেই, যাদের ডাকে তিনি সে দেশে গিয়ে উপস্থিত হোতে পারেন, কিম্বা যারা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে' তাঁর আগমনের সুবিধা করে দিতে পারে। এর কারণ পূর্ব্বেই একবার বলা হয়েছে। তুর্ক-রাজের মন্ত্রিগণ সবই তার দাস ও বেতনভোগী বলে তাদের হাত করতে পারলেও, তাতে বিশেষ কোন লাভ নেই। কেননা, দেশের লোকদের উপর তাদের কোন প্রভাব না থাকায় তাদের কথা মত কেউই নবাগত বিদেশী রাজাকে সাহায্য করতে আসবে না। এসব কথাও পূর্ব্বেই একবার আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই যিনি তুর্কী-সাম্রাজ্য আক্রমণ করতে যাবেন, তাঁর মনে রাখতে হবে যে সম্মিলিত তুর্ক-শক্তির সঙ্গেই তাঁর লড়তে হবে এবং লড়তে হবে সম্পূর্ণ নিজের শক্তির উপর নির্ভর করেই—সে দেশে কেউ যে বিদ্রোহ করে তাঁর বিশেষ কোন সুবিধা করে দেবে, সে আশা দুরাশা মাত্র। কিন্তু তিনি যদি একবার তুর্ক-শক্তিকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে তুর্ক-রাজের সৈন্যদিগকে এমনভাবে ছত্রভঙ্গ করে' দিতে পারেন, যাতে আর সে বাহিনী পুনরায় গড়ে তোলার জো না থাকে, তবে আর তাঁর কোন ভয়ের কারণ নেই। কেবল তখনও রাজবংশের যারা বেঁচে রইলো, তাদের সম্বন্ধে একটা

পাকা বন্দোবস্ত করতে পারলেই কাজ সমাধা হয়ে যায়; কারণ রাজবংশ সমূলে ধ্বংস হয়ে গেলে, ভয় করবার কেউই অবশিষ্ট থাকলো না। একে তো দেশে এমন কেউই নেই, যার প্রভাব দেশের সাধারণ লোকদের উপরে অপ্রতিহত ও সুপ্রচুর। তার উপরে সে দেশ অধিকার করতে নূতন রাজা সে দেশের কোনো লোকেরই সাহায্যে গ্রহণ করেননি বলে, কাউকেই আর ভয় করে চলা তার পক্ষে অনাবশ্যক।

কিন্তু যে দেশে ফ্রান্সের মত শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত সেখানে এরূপ হয় না—বরং তার উল্টোই ঘটে। সেসব দেশে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অনেক লোক সব সময়েই দেখা যায়, যারা প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থার প্রতি অসন্তুষ্ট এবং মনে মনে বিদ্রোহী। তারা যে সর্ব্বদা দেশের শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য একান্ত আগ্রহান্বিত থাকে, তা বলাই বাহুল্য। এইরূপ অসন্তুষ্ট লোকদের হাত করে যে কেউ বাইরে থেকে এসেও এরূপ দেশে জায়গা করে নিতে পারে। কারণ, এই সব লোকেরাই তাকে পথ দেখিয়ে দেশে নিয়ে আসবে ও তার জয় যাতে অনায়াসেই হয়, তার ব্যবস্থা করবে। কেন এরূপ হয়, তা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু তার শাসন কর্ত্তৃত্ব সে দেশে পরে অক্ষুণ্ণ রাখা খুবই শক্ত ব্যাপার। কত অসুবিধার সঙ্গে যে তাকে লড়তে হবে, তার সীমা-সংখ্যা নেই। যারা তোমার শত্রু ছিল ও সেই কারণে যাদের শক্তি ধ্বংস করতে তুমি বাধ্য হয়েছো, তাদের তো কথাই নাই। যারা তোমার বন্ধু ছিল ও সে দেশ জয়ে তোমায় সাহায্য করেছে তারাও নানা অসুবিধা সৃষ্টি করে তোমায় ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে। সে ক্ষেত্রে রাজবংশ ধ্বংস করতে পারলেই যে সব নিরাপদ হয়ে গেল, তা মোটেই নয়। কারণ অভিজাত-সম্প্রদায় অটুট অব্যাহত রয়ে গেলো বলে তাদের ভিতর থেকেই নূতন বিপদ আসবে। তাদের ভিতরের

কেউ হয়তো কোন কারণে তোমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তোমার বিরুদ্ধে নূতন আন্দোলনের নেতা হয়ে দাঁড়াবে। অথচ সমস্ত অভিজাত সম্প্রদায়কে খুসী রাখা কিংবা সম্পূর্ণ ধ্বংস করা—কোনটাই তোমার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। কাজেই ঘটনার যোগাযোগ যখনই তোমার শত্রুর অনুকূল ও তোমার প্রতিকূল হয়ে উঠবে, তখনই সে দেশ তোমার হস্তচ্যুত হয়ে যাবে।

একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে দরায়ুসের রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা তুর্ক-সাম্রাজ্যেরই অনুরূপ ছিল। তাই আলেকজেণ্ডার দরায়ুসকে যুদ্ধক্ষেত্রে একবার হারিয়ে দিয়ে অতি সহজেই তার রাজ্য অধিকার করে নিতে সমর্থ হয়েছিল। যুদ্ধে দরায়ুস মারা যেতে তার সমস্ত রাজ্যটাই আলেকজেণ্ডারের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে গেলো। কি কারণে যে তা সম্ভবপর হয়েছে, তা পূর্ব্বেই বলেছি। আলেকজেণ্ডারের উত্তরাধিকারীরা যদি এক মতে এক যোগে চলতে পারতো, তবে তাদের পক্ষেও দরায়ুসের রাজ্য শাসন করা সহজ-সাধ্য ও নিরাপদ হয়েই থাকতো। কেননা তাদের নিজেদের ঝগড়াঝাটি ছাড়া রাজ্যের কোথাও কোনো অশান্তি—কোনো গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয় নি।

কিন্তু যে দেশে ফ্রান্সের মত শাসনপদ্ধতি প্রচলিত, সে দেশ শাসন করা এরূপ নির্ব্বিবাদে হওয়া সম্ভবপর নয়। এই জন্যই স্পেন, ফ্রান্স ও গ্রীস-দেশে রোমান-শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ লেগেই ছিল। এই সব দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বা জমিদারীতে বিভক্ত ছিল এবং যতদিন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পৃথক অস্তিত্বের স্মৃতি জনগণের মন থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না হয়েছে, ততদিন এই সব দেশে রোমানদের শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হোতে পারে নি। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের দীর্ঘকালব্যাপী স্থায়িত্ব ও বিপুল শক্তি সামর্থ্যের জন্য পরে যখন পুরাতন স্মৃতি লোকের মন থেকে

একেবারে মুছে গিয়েছিল তখন এই সব দেশে রোমান-শাসন সম্পূর্ণ নিরাপদ হ'তে পেরেছিলো। আরো পরে যখন রোমানদের নিজেদের ভিতরেই ঝগড়া-বিবাদ উপস্থিত হ'ল, তখন তাদের মধ্যে যিনি সাম্রাজ্যের যে অংশে পূর্ব্ব থেকে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তিনিই সেই অংশের মালিক হয়ে বসলেন এবং সে অংশের পুরাতন স্থানীয় রাজবংশ বহু পূর্ব্বেই সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যাওয়ায়, স্থানীয় অধিবাসীরা রোমানদের ছাড়া আর কাউকেই দেশের শাসনকর্ত্তা বলে মেনে নিতে রাজি হয় নি।

এই সব কথা মনে রাখলে, কেউ-ই বিস্মিত হবে না এই ভেবে, যে আলেকজেণ্ডার কেমন করে এত বড় এসিয়ার সাম্রাজ্যে শাসনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন, অথবা পিরাসের (Pyrrhus) মত অন্যান্য লোককেই বা কেন এত বেগ পেতে হয়েছিল তাদের অধিকৃত স্থানে শাসন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে। বিজয়ী রাজার বিচক্ষণতার প্রাচুর্য্য কিম্বা তার অভাবের জন্যেই যে এরূপ হয় তা নয়। এরূপ হওয়ার একমাত্র কারণই হচ্ছে, দেশের সাধারণ লোকদের ভিতরে সমতার অভাব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্বায়ত্ত-শাসনে অভ্যস্ত দেশ বা নগর জয় করে' সেখানে কিরূপ শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক, সেই সম্বন্ধে আলোচনা।

স্বায়ত্ত-শাসনে অভ্যস্ত এমন কোনো সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র পূর্ব্বোক্ত উপায়ে অধিকার করে' যিনি সে দেশে তাঁর শাসন-কর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে চাইবেন, তাঁকে নিম্নলিখিত তিনটি উপায়ের যে কোন একটি অবলম্বন করতে হ'বে। প্রথমতঃ তিনি সে দেশের লোকদের ধ্বংস সাধন করতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি নিজে গিয়ে তাদের ভিতরে বসবাস করতে পারেন। তৃতীয়তঃ তিনি তাদের নিজস্ব আইন-কানুন বজায় রেখে সেখানে এক অভিজাত-তন্ত্র গড়ে তুলতে পারেন। দেশ শাসনের ভার তাদের হাতেই ছেড়ে দিয়ে তিনি শুধু উপযুক্ত কর গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট থাকবেন। আশা করা যায়, এরা কখনই তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কারণ তারা জানে যে রাজাই তাদের সৃষ্টি করেছে এবং তাঁর সাহায্য ব্যতীত এক দণ্ডও তাদের শাসন টিকতে পারে না। তাই তারাও প্রাণপণে তার ক্ষমতা অটুট অব্যাহত রাখতেই চেষ্টা করবে। কাজেই, স্বায়ত্ত-শাসনে অভ্যস্ত কোনো নগর দখল করে যিনি সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে চান, তাঁর পক্ষে সে দেশের

লোক দিয়েই সে দেশ শাসন করা যত সহজ, এমন আর অন্য কোনো রকমেই হোতে পারে না—এমনটাই মনে হয়।

উদাহরণ স্বরূপ রোমান ও স্পার্টানদের কথা বলা যেতে পারে। এই উদাহরণ থেকেই আমরা সহজে বুঝতে পারবো যে এই তিন পথের ভিতরে কোন্‌টা কতখানি ফলপ্রসূ। স্পার্টানরা এথেন্‌স্‌ ও থিব্‌স্‌ অধিকার করে উভয় পৌররাষ্ট্রেই অভিজাত-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কিন্তু তা স্বত্বেও তাদের উভয় রাষ্ট্রকেই হারাতে হয়েছিল। কিন্তু রোমানরা কাপুয়া, কার্থেজ ও নুমান্তিয়া অধিকার করে তাদের দুর্গ-প্রাকারাদি আত্ম-রক্ষার যা কিছু সাজসরঞ্জাম সব ধ্বংস করে ফেলেছিল। ফলে এ সব স্থানে তাদের স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্পার্টানরা গ্রীসদেশে যে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেছিলো, রোমানরাও গ্রীস জয় করে, সেখানে তদনুরূপ ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল। তাদের মতই রোমানরা গ্রীসের স্বায়ত্ত-শাসন ও নিজস্ব আইন-কানুন বজায় রেখে চলতে চেয়েছিলো। কিন্তু সেরূপ ব্যবস্থায় তারা দেশে শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারেনি। তাই তারা গ্রীসের অনেকগুলি নগরের সুদৃঢ় দুর্গ-প্রাকারাদি ভেঙে ফেলতে বাধ্য হয়েছিলো। এরূপ নগরাদি জয় করে চিরস্থায়ীভাবে আয়ত্তে রাখতে হ'লে এগুলির শক্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়াই যে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ পথ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অপরদিকে যিনি এরূপ স্বায়ত্ত-শাসনে অভ্যস্ত কোনো নগর জয় করে, তার শক্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে না দিবেন, সেই নগরই চেষ্টা করে' তাঁর ধ্বংসের ব্যবস্থা করবে। কারণ এরূপ নগরের পক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করার অজুহাতের অভাব হবে না কখনই। লুপ্ত স্বাধীনতা ও গত দিনের স্বাধিকার ভোগের স্মৃতি বহুদিনের ব্যবধানেও কিম্বা অন্যের হাত থেকে বহু নূতন সুবিধা-ভোগের ফলেও মানুষের

মন থেকে লুপ্ত হয়ে যায় না। তাই সেই পুরাতনের দোহাই দিয়েই যে কোন সময়ে নবাগতের বিরুদ্ধে দেশের জন-মতকে উদ্বুদ্ধ করা বিশেষ শক্ত নয়। তুমি যে কোনো ব্যবস্থাই করো না কেন, একমাত্র যদি তারা নিজেরা একতাহীন ও ইতস্ততঃ তাড়িত—বিক্ষিপ্ত হয়ে না পড়ে, তবে তারা কখনো বিগত দিনের সুখ-সুবিধার কথা ভুলবে না এবং যখনি সুবিধা হবে, তখনই তারা সবাই মিলে সেই পুরানো দিন ফিরিয়ে আনবার আশায় লড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াবে। এর চমৎকার দৃষ্টান্ত পিসা; একশ' বছর ফ্লোরেন্সের অধীনে কাটিয়েও পিসা তার লুপ্ত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলো।

কিন্তু যে সব পৌর-রাষ্ট্র বরাবর রাজ-শাসনেই অভ্যস্ত, সে সব পৌর-রাষ্ট্র অধিকার করে, সেখানকার পুরাতন রাজবংশ সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে পারলে আর কোন ভাবনার কারণ থাকে না। যেহেতু তথাকার অধিবাসীরা বরাবর অপর কাউকে মেনে চলতেই অভ্যস্ত। অথচ রাজবংশের কেউ বেঁচে না থাকায়, তারা না পারবে নিজেদের ভিতর থেকে কাউকে রাজা বলে মানতে, না পারবে অভিজ্ঞতার অভাবে নিজেরা নিজেদের শাসন চালাতে। এই কারণে তারা নবাগতের বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করতে সহজে রাজী হবে না। তাই নূতন রাজাও অল্প চেষ্টায়ই তাদের হাত ক'রে নিজের পক্ষপাতী করে তুলতে পারবেন। কিন্তু গণতন্ত্র সম্বন্ধে একথা খাটে না। সেখানকার লোকের নবাগতের প্রতি ঘৃণা ও প্রতিশোধের স্পৃহা অধিকতর প্রবল এবং তাদের কাজ করার শক্তিও অপেক্ষাকৃত বেশী। অতীত স্বাধীনতার স্মৃতি তাদের মন থেকে কখনো লুপ্ত হয় না। অতএব পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটি পথের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ পথ হচ্ছে, তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করা। তা সম্ভবপর না হোলে অন্ততঃ পক্ষে রাজার নিজের গিয়ে তাদের মধ্যে বসবাস করা উচিত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

স্বকীয় বাহুবল ও নৈপুণ্যে অধিকৃত রাজ্য

এই পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ নূতন রাজতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। এই আলোচনায় যে সব উদাহরণ দেওয়া হবে, তার সবগুলিই যদি শ্রেষ্ঠ পুরুষ বা আদর্শ রাষ্ট্র সম্বন্ধে হয়, তবে তাতে আশ্চয্য হবার কোনো কারণ নেই। আমরা যখন কাউকে অনুকরণ করতে চেষ্টা করি, তখন সমস্ত কাজ-কর্ম্ম হুবহু তার মত করে করা সম্ভবপর হয় না; কতকটা অসম্পূর্ণতা থাকবেই থাকবে। এরূপ অবস্থায় যাঁরা বুদ্ধিমান, তাঁরা সর্ব্বদা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ অনুসরণ করেন—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষিগণের কার্য্যাবলী অনুকরণ করে চলতে চেষ্টা করেন। কারণ তাতে তাদের মত অতখানি না উঠতে পারলেও, তাঁদের পন্থায় অনেকখানি এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়, সন্দেহ নেই। কথায় বলে—'আশার অর্দ্ধেক ফল'। কাজেই আদর্শ সব সময়েই উচু করে রাখতে হয়। চতুর ধনুর্দ্ধর যেমন উচ্চতর লক্ষ্যের প্রতি শর সন্ধান করে' নিম্নতর লক্ষ্য ভেদ করে, সেইরূপ সকলেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ অনুসরণ করে চলা উচিত। ধনুর্দ্ধর যখন দেখে যে লক্ষ্যটা এতদূরে যে সোজা সেই দিকে তাক্ করে শর ছুড়লে লক্ষ্য ভেদ করা সম্ভব হবে না, তখন সে আরো উচু দিকে লক্ষ্য করেই শর নিক্ষেপ করে। তার মানে এ নয় যে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়িয়ে সে

আরো উর্দ্ধে তীর ছুঁড়তে চায়। নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ভেদ করাই তার চেষ্টা কিন্তু সে জানে যে উচ্চতর লক্ষ্যের প্রতি তাক্ না করলে অতি দূরে অবস্থিত নিম্নতর লক্ষ্য ভেদ করা যায় না।

যখন কোনো সাধারণ লোক কোনো দেশ জয় করে' নূতন রাজ্য স্থাপন করেন, তখন তাঁর শাসন সে দেশে কতদিন অব্যাহত থাকবে, তা নির্ভর করে সম্পূর্ণ তাঁর নিজের কর্ম্ম তৎপরতার উপরে। তবে সাধারণ অবস্থা থেকে যে তিনি রাজা হয়েছেন, তাতেই প্রমাণ হয় যে, হয় তাঁর নিজের কর্ম্ম-তৎপরতা যথেষ্ট, নয়তো ভাগ্য তাঁর অত্যন্ত অনুকূল এবং এই দুয়ের একটা থাকলেই যে তাঁর অসুবিধার অনেকখান লাঘব হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই দুয়ের মধ্যে ভাগ্যের উপর কম নির্ভর করতে হোলেই যে বিপদের আশঙ্কাও কমে যায়, তা বলাই বাহুল্য। তার উপরে আবার, এরূপ নূতন রাজার অন্য আর কোনো রাজ্য না থাকায়, তিনি এই নূতন রাজ্যেই বসবাস করতে বাধ্য হন বলে শাসন-সমস্যা আরও অনেক সহজ হয়ে যায়।

যারা ভাগ্যের কৃপাদৃষ্টির উপর নির্ভর না করে আপন ক্ষমতায়ই বড় হয়েছে, তাদের ভিতরে মুশা, সাইরাস্, রোম্যুলুস্, থিসিউস প্রভৃতির দৃষ্টান্তই চমৎকার দৃষ্টান্ত। মুসার দৃষ্টান্ত অবশ্য একটু অসাধারণ রকমের। ভগবান তাঁর পিছনে পিছনে থেকে যে আদেশ দিয়েছেন, তিনি তাই পালন করে গিয়েছেন। তাই সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর কোন তুলনাই হয় না বলে, তাঁর সম্বন্ধে আলোচনাই সম্ভব নয়। তথাপি তাঁর যে সব গুণ তাঁকে ভগবানের সঙ্গে কথা বলার যোগ্যতা প্রদান করেছে, সে সবের জন্যেও অন্ততঃ তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। কিন্তু সাইরাস্ ও আর সবাই যাঁরা নিজের ক্ষমতা বলে নূতন নূতন রাজ্য স্থাপন করেছেন, তাঁদের কথা ভাবতে গেলে তারিফ্ না করে পারা যায়

না। তাঁদের কাজ-কর্ম্ম, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে খুঁটিনাটি আলোচনা করেও আমরা দেখতে পাই যে, মুশার মত যদিও হাত ধরে পথ দেখিয়ে দিয়ে কোনো ভগবান তাঁদের সাহায্য করেন নি, তবু তাঁরা কোন অংশেই মুশার চেয়ে ন্যূন ছিলেন না। তাঁদের জীবন ও কাজ-কর্ম্ম আলোচনা করে আমরা আরো দেখতে পাই যে তাঁরা কেউ-ই ভাগ্যের হাত থেকে পাওয়া ধনে ধনী হন নি—তাঁরা যা করেছেন, সব নিজের ক্ষমতায়ই করেছেন। তবে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা তাঁরা পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেই সুযোগ সুবিধাকে তারা কাঁচা মাল হিসেবে ব্যবহার ক'রে নিজেদের ইচ্ছামত রূপ দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁরা নিজেরাই ছিলেন শিল্পী, স্রষ্টা—সুযোগ-সুবিধা সে সৃষ্টির উপলক্ষ্য মাত্র। এ কথা সত্যি যে সুযোগ-সুবিধা না পেলে তাঁদের যোগ্যতা ও মানসিক শক্তি হয়তো শুকিয়ে মরে মরে যেতো। কিন্তু তাদের যোগ্যতা ও মানসিক শক্তি যদি না থাকতো, তাহলেও সুযোগ সুবিধা কোন কাজেই আসতো না—সম্পূর্ণ-ই নিষ্ফল হোয়ে যেতো।

ইজ্‌রেল্‌বাসীরা মিশর দেশে দাসের দাস হয়ে কাল কাটাচ্ছিলো। মিশরীয়দের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তারা মুক্তির আশায় সহজেই মুশার নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলো। মুশা যদি এই অবস্থায় ইজ্‌রেল্‌বাসীদের না পেতেন, তবে হয়তো ইজ্‌রেল্‌বাসীদের দাসত্ব-শৃঙ্খল হতে মুক্ত করার মত কাজ তাঁর হাতে আসতো না—তাঁর অসাধারণ যোগ্যতাও কোনো কাজে লাগতো না। রোম্যুলাস্ যে জন্মের পরেই পরিত্যক্ত হয়েছিলেন ও পরে আল্‌বা ছেড়ে চলে এসেছিলেন—এরূপ ঘটনার যোগাযোগ না হোলে রোমের রাজা হওয়া ও রোম নগরী গড়ে তোলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হোতো না। সাইরাসের সময়ে মিদিস্ রাজবংশের কুশাসনের ফলে পারসিকদের ভিতরে ভয়ানক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল

এবং মিদিস্‌রাও বহুদিনের শান্তি ভোগের ফলে অতিরিক্ত অকর্ম্মণ্য ও দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল। দেশের অবস্থা তখন যদি এরূপ ঘোরাল না হয়ে উঠতো, তবে সাইরাস্ হয়তো কিছুই করতে পারতেন না। আথেনীয়গণ যদি বিতাড়িত, বিক্ষিপ্ত ও একতাহীন হয়ে না পড়তো, তবে হয়তো থিসিয়ুস্ তার কর্ম্মক্ষমতা ও বিচক্ষণতা কিছুই দেখতে পারতেন না। এ সবই সত্য কথা, সন্দেহ নেই। কিন্তু সুযোগ-সুবিধাই মানুষকে ঠেলে বড় করে' তুলতে পারে না। যার যথেষ্ট যোগ্যতা ও বিচক্ষণতা আছে, শুধু সে-ই নিজেও বড় হয়, দেশেরও সুনাম বাড়ায়।

যাঁদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো, তাঁদের মত যারা নিজ বাহুবলে রাজ্য স্থাপন করতে চায়, তাদের প্রথমটায় যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। কিন্তু একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, তার পরে তার রক্ষণাবেক্ষণ তাঁদের পক্ষে খুবই সহজ। প্রতিষ্ঠার সময় যে বেগ পেতে হয়, তা অনেকটা এই জন্যে যে, নূতন দেশের শাসন সংরক্ষণের জন্যে অনেক নূতন নূতন আইন-কানুন ও বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করতে হয়—অথচ মানুষ সে সম্বন্ধে অভ্যস্ত নয় বলে, তা মানতে চায় না। বাস্তবিক নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করতে যাওয়ার মত মুস্কিলের কাজ আর নেই। কাজটা যেমন শক্ত তেমনি আবার তার পরিচালনার কাজে যথেষ্ট বিপদ আছে। অথচ এত করেও সাফল্যলাভের সম্ভাবনা অতি অনিশ্চিত। কারণ পুরাতন ব্যবস্থায় যারা লাভবান হচ্ছিলো, তারা তো নূতনের শত্রু হয়ে রয়েছেই, অধিকন্তু যারা নূতন ব্যবস্থায় লাভবান্ হবে বলে আশা করছে, তারাও সমগ্র মন দিয়ে নূতনকে গ্রহণ করতে ভরসা পায় না। নূতনের প্রতি লোকের আগ্রহহীনতার কারণ কতকটা এই যে নূতন ব্যবস্থা যাদের অনুকূল, অন্যেরা সব সময়েই তাদের কাছ থেকে অনিষ্ট আশঙ্কা করে ভয়ে ভয়ে থাকে। এবং আর কতকটা এই যে, বহু দিনের অভিজ্ঞতায়

মানুষ নূতন ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হয়ে না উঠলে, নূতনের প্রতি আস্থা স্থাপন করতে পারে না। তাই যারা নূতন ব্যবস্থার বিরুদ্ধবাদী, তারা যখনি সুবিধা পায়, তখনই সবাইকে এক সঙ্গে জুটিয়ে এক দল হয়ে নূতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কিন্তু যারা নূতনের পক্ষপাতী বলে পরিচিত, তারা তখনও সমগ্র মন দিয়ে নূতনের সমর্থনে এগিয়ে আসে না—কাজ যা করে তা-ও আধা আধা ভাবে করে। ফলে তারা নিজেরা তো বিপদগ্রস্ত হয়-ই, রাজারও বিপদ ঘনিয়ে আসে।

এ সম্বন্ধে আরো আলোচনা করতে হোলে প্রথমেই কথা ওঠে যে এই সব নূতনের প্রবর্ত্তকেরা নিজেদের শক্তির উপরে ভরসা রেখেই সব করছে, না অন্যের উপর নির্ভর করা ছাড়া তাদের উপায় নেই? অর্থাৎ আবশ্যক হোলে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে তারা ইচ্ছা মত জোর খাটাতে পারবে কিনা, না সাহায্যের জন্যে তাদের আর কারো কাছে মিনতি জানাতে হবে? অন্যের উপর নির্ভর করতে হোলে তার ফল কখনই ভাল হয় না এবং সে অবস্থায় কোনো দিক দিয়েই কিছু করে তোলা যায় না। কিন্তু যারা নিজের ক্ষমতার উপরেই নির্ভর করে চলে ও আবশ্যক মত জোর খাটাতে পারে, তাদের প্রায় কখনই কোনো বিপদের কারণ ঘটে না। এই জন্যেই দেখা যায় যে বাইবেলোক্ত ধর্ম্মগুরুদের (Prophets) ভিতরে যাঁরা অস্ত্রবলে বলীয়ান তাঁরা জয়ী হয়েছেন,—যারা অস্ত্রহীন, তারা ধ্বংস পেয়েছেন। তারপরে, সাধারণ লোকের স্বভাবও অতিশয় পরিবর্ত্তনশীল। সহজেই হয়তো তাদের তোমার মতে আনতে পারবে কিন্তু বেশীক্ষণ সে মতে টিকিয়ে রাখা অত্যন্ত কঠিন। কাজেই অবস্থা যখন এমন হবে যে লোকে তোমায় একবার বিশ্বাস করে' পরে আর সে বিশ্বাস বজায় রাখতে পারে না, তখন তাদের জোর করে বিশ্বাস করাতে পারা চাই।

মুসা, সাইরাস, থিসিয়ুস ও রোমুলুসের যদি অস্ত্রবল না থাকতো, তবে কখনই তাঁদের শাসন-ব্যবস্থা বেশীদিন টিকিয়ে রাখতে পারতেন না। বর্ত্তমান যুগে ফ্রা গিরোলামো সাভোনারোলার দৃষ্টান্তই তার প্রমাণ। যখনই তিনি দেশের লোকের বিশ্বাস হারালেন, সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর শক্তি ও শাসন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো। তাঁর নিজের এমন কোন শক্তি ছিল না, যার বলে তিনি যারা অবিশ্বাসী, তাদের জোর করে বিশ্বাস করাতে পারেন কিম্বা যারা প্রথমে তাঁর প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ হয়েছিল, তাদের বিশ্বাস অটুট রাখতে বাধ্য করতে পারেন। তাই এদের মত যারা, তাদের প্রচেষ্টার পূর্ণ সাফল্য লাভের পথে বহু বাধা। তারা যত এগিয়ে চলে, বাধার চাপও তত বেড়ে যায়। তথাপি ক্ষমতাবান লোকের পক্ষে কোন বাধাই বাধা নয়—বাধা যত বড় হয়েই আসুক, তা তারা ডিঙিয়ে যাবেই। প্রথম কিছুদিন সমস্ত বিপদ-বাধা জয় করে' এগিয়ে যেতে পারলে এবং তার জয় দেখে যারা হিংসা করে, তাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিতে পারলে, ক্রমে তারা সকলের সম্মানের পাত্র হয়ে উঠবে এবং তারপর থেকে সুখে, শান্তিতে সসম্মানে ও নিরাপদে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতা ভোগ করতে থাকবে।

এই সঙ্গে আমি আর একটা ছোট দৃষ্টান্ত দিতে চাই। ছোট হোলেও উপরের বড় বড় দৃষ্টান্তগুলির সঙ্গে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এ বিষয়ে এই একটা দৃষ্টান্তই আমি যথেষ্ট মনে করি। দৃষ্টান্তটা সাইরাকুস্‌বাসী হিয়েরোর দৃষ্টান্ত। এই ব্যক্তি সাধারণ অবস্থা থেকে সাইরাকুসের রাজা হয়েছিলেন। তিনি যে দৈববলে বা শুভাদৃষ্টবশে হঠাৎ বড় হয়েছিলেন, তা নয়—নিজের শক্তিতে সুযোগ-সুবিধাকে কাজে লাগাতে পেরেছিলেন বলেই তিনি বড় হয়েছিলেন। সাইরাকুস্‌বাসীদের প্রতি যখন অকথ্য অত্যাচার চলছিল, তখন তারা সকলে মিলে

হিয়েরোকে তাদের সেনাপত্তিপদে বরণ করে। পরে তার কৃতকার্য্যতার ফলে পুরস্কারস্বরূপ রাজপদ সহজেই তার হস্তগত হয়। সাধারণ লোক হিসাবেও তিনি যথেষ্ট ক্ষমতাবান পুরুষ ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে লিখ্‌তে গিয়ে একজন লেখক লিখেছেন যে তিনি রাজোচিত এত বহু গুণে গুণান্বিত যে একটা রাজ্য থাকলেই তিনি রাজা হতেন, অর্থাৎ রাজত্ব তার পক্ষে এতটুকুও বেমানান হবে না। তিনি পুরানো সৈন্য-বাহিনী নষ্ট করে দিয়ে নূতন সৈন্য দল গড়ে তুলেছিলেন। তিনি পুরানো সন্ধি নাকচ করে দিয়ে নূতন লোকের সঙ্গে নূতন সন্ধি কায়েম করেছিলেন। তার নিজের হাতে গড়া সৈন্যদল ছিল ও নিজের চেষ্টায় সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ বহু মিত্র জুটেছিল। এরূপ শক্ত ভিত্তির উপরে যে কোন ইমারত গড়ে তোলা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। তাই রাজ্যের মালিক হোতে তাঁকে যথেষ্ট বেগ পেতে হোলেও, পরে কিন্তু বজায় রাখতে তাঁকে আর বিশেষ কোন অসুবিধায় পড়তে হয়নি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অপরের অস্ত্র-বলে কিম্বা সৌভাগ্যক্রমে অর্জ্জিত রাজ্য

যারা সাধারণ অবস্থা থেকে হঠাৎ সৌভাগ্যক্রমে রাজ-তক্‌তে বসে, তাদের বড় হোতে বেগ পেতে হয় না বটে, কিন্তু যত গণ্ডগোল ও হাঙ্গামা এসে জোটে সেই বড়ত্ব বজায় রাখতে। তারা উড়ে এসে হঠাৎ জুড়ে বসে—তাই তাদের প্রথম দিকটাতে বিশেষ কোনো মুস্কিল না হোলেও জুড়ে বসার পরেই যত রাজ্যের বাধা-বিপত্তি এসে দেখা দেয়। যারা অন্যের দয়ায় কিম্বা অর্থের বিনিময়ে রাজ্যলাভ করে, তাদেরও এই দশা। গ্রীসদেশে এবং আইয়োনিয়া ও হেলেস্‌পণ্টের নগরগুলিতে এরূপ অবস্থা বহু লোকের হয়েছিল। এই সব স্থানে পারস্য-রাজ দরায়ুস্‌ বহু লোককে রাজা করে বসিয়েছিলেন। তাঁর মতলব ছিল এই যে, এ সব ছোট ছোট রাজারা তার তাঁবে থেকে এই সব নগর-রাজ্যগুলি শাসন করতে থাকলে, তাতে তাঁরি গৌরব বাড়্‌বে ও তাঁর নিজের রাজ্য আরো নিরাপদ হবে। যারা অসদুপায়ে সৈন্যদের হাত করে সম্রাট হয়ে বসে, তাদেরও অবস্থা এরূপই হয়ে থাকে। কারণ যারা এদের বড় করেছে, তাদের সন্তুষ্টি ও সৌভাগ্যের উপরেই এদের সম্পূর্ণ নির্ভর। অথচ এই দুটি জিনিষের মত এমন অ-স্থির দুনিয়ায় আর কিছু নেই। তা ছাড়া

তারা হঠাৎ যে উচ্চ পদ লাভ করে, তার উপযুক্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতারও তাদের একান্ত অভাব। তারা চিরকাল সাধারণ লোকের মত সাধাসিধা জীবন যাপন করেছে। একদিন হঠাৎ উচ্চপদ লাভ করেই যে তারা লোক পরিচালনায় দক্ষ হয়ে উঠবে—এমনটা আশা যায় না, যদি না তাদের একটা অতি অসাধারণ যোগ্যতা ও কার্য্য-কুশলতা থাকে। সর্ব্বোপরি, তাদের একান্ত বিশ্বাসী ও অনুরক্ত নিজস্ব সৈন্য না থাকায় তারা তাদের মান-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাক্ষতে কিছুতেই সক্ষম হবে না। প্রকৃতিতে যা হঠাৎ গড়ে, হয় সে তাড়াতাড়ি বড় হয়, নয় বেজায় ঠুনকো হয়ে থাকে—বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়বার ক্ষমতা তার অতি কম। সেরূপ যে রাষ্ট্র হঠাৎ গজিয়ে ওঠে, তার ভিত্তি থাকে এত কাঁচা ও বৈদেশিক বন্ধুত্ব বন্ধনের জোর এত ফিঁকে যে বিপদের ঝড় যখন ঘনিয়ে আসে, তখন তার এক ঝট্‌কাতেই তা তাসের ঘরের মত উড়ে যায়। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতে পারে, একমাত্র যদি এই সব হঠাৎ-রাজারা খুব ক্ষমতাবান লোক হয়, যদি তারা প্রথম থেকেই হুঁসিয়ার থাকে যে ভাগ্য তাদের হাতে যা এনে দিয়েছে, তা রক্ষা করতে হোলে তার পেছনে যথেষ্ট চেষ্টা থাকা চাই, যদি বিশেষ ভাবে মনে রাখে যে অন্যেরা যে ভিত পাকা গেঁথে তোলে রাজা হবার আগে, তাদের তেমনি করে সে ভিত গড়ে তুলতে হবে—তবে তাদের বেলায় তা আগে না হয়ে, পরে—এই যা তফাৎ।

নিজের ক্ষমতায় রাজা হওয়া ও সৌভাগ্য ক্রমে হঠাৎ-রাজা হওয়া—এই দু রকমের দুটো দৃষ্টান্ত আমি দেবো। আমি যাদের কথা বলবো, তারা বড় বেশী দিনের লোক নয়—তাদের ভুলে যাওয়ারও দিন আসেনি। তাদের এক জন ফ্রান্‌সেস্কো স্ফর্জা ও আর একজন সিজার বোর্জিয়া। ফ্রান্‌সেস্কো সাধারণ অবস্থা থেকে মিলানের ডিউক হয়েছিলেন। তিনি

সম্পূর্ণ নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করেই এ কাজে এগিয়েছিলেন; এবং অবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা করে অভীষ্ট ফল লাভ করেছিলেন। তাই যে গদী লাভ করতে তাকে বহু ঝঞ্ঝাট সইতে হয়েছে, লাভ করার পরে তা অক্ষুণ্ণ রাখতে আর তার বিশেষ কোন বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু সিজার বোর্জিয়া—যাকে লোকে ডিউক ভালেনটিনো বলেই জানতো—তিনি তার পিতার প্রভাবে গদী পেয়েছিলেন এবং সে প্রভাবের অবসানেই আবার তা হারিয়েছিলেন। পরের অস্ত্র সাহায্যে ও নিজের সৌভাগ্য বলে বড় হয়ছে—এমন কোন বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাশালী লোকের পক্ষে যা কিছু করা দরকার নিজের আসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করতে, ডিউক তা সবই করেছিলেন। তা সত্বেও তিনি শেষ পর্য্যন্ত নিজের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে নি।

পূর্ব্বেই বলেছি, রাজত্বের ইমারত গড়তে হোলে, সর্ব্ব প্রথমে তার ভিত্তি পাকাপোক্ত করে গড়তে হবে। ভিত্তি পরেও গেঁথে তোলা চলে বটে, যদি যে গাঁথবে, তার যথেষ্ট ক্ষমতা ও শিল্প-নৈপুণ্য থাকে। কিন্তু তাতে বেগ পেতে হবে অপরিসীম এবং এত করেও সে ইমারতে বাস করা সম্পূর্ণ নিরাপদ হবে না কখনই। গদী পাওয়ার পরে ডিউক যে সব ব্যবস্থার পত্তন করেছিলেন, তা থেকে বোঝা যায় যে রাজ্যের ভিত্তি পাকা করে তুলতে হোলে, যা কিছু দরকার, তিনি ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে সবই করেছিলেন। তবু তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। তা বলে যদি কেউ মনে করেন যে তার দৃষ্টান্তের আলোচনা অনাবশ্যক, তবে সে মতে আমি মত দিতে পারি না। বরং আমি মনে করি যে কোন নূতন রাজার পক্ষে ডিউকের আদর্শের মত এমন চমৎকার আদর্শ আর কিছুই হোতে পারে না। ডিউক যদি সফলকাম হোতে না পেরে থাকেন, তার সব প্রচেষ্টাই যদি ব্যর্থ হয়ে থাকে, তার জন্য তিনি নিজে দায়ী নন

একবিন্দুও। তার কোন দোষে যে এমনটা হয়েছে, এ কথা কেউ বলতে পারবে না। তার অদৃষ্টই ছিল নিতান্ত বিরূপ—এ ছাড়া আর অন্য কিছু বলা চলে না।

ডিউকের পিতা পোপ ষষ্ঠ আলেক্‌জেণ্ডার তাঁর ছেলেকে কোনো জনপদের মালিক করে বসাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দেখলেন তাতে সমূহ ও ভাবী বাধা-বিপত্তির অন্ত নেই। প্রথমতঃ চার্চ্চের সম্পত্তি ছাড়া আর কোথা হোতে যে ছেলের জন্য সম্পত্তি সংগ্রহ করা যেতে পারে, তা তিনি ভেবে পেলেন না। অথচ তাঁর ইচ্ছা থাকলেও, মিলানের ডিউক ও ভেনেসিয়ান্‌রা যে চার্চ্চের কোনো সম্পত্তি ডিউকের হাতে তুলে দিতে রাজি হবে না, তাতে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না। ফায়েন্‌জা ও রিমিণ ত ইতিপূর্ব্বেই ভেনেসিয়ান্‌দের রক্ষণাবেক্ষণে চলে গিয়েছিল। এ ছাড়া, তিনি দেখলেন যে ইতালীর শক্তিবৃন্দ—বিশেষ করে ওর্‌সিনি ও কোলোন্নেসীরা, যাদের সাহায্যের উপর তাকে অনেকটা নির্ভর করতে হবে, তাদের কেউই তার শক্তিবৃদ্ধি পছন্দ করবে না। এরূপ অবস্থায় এই শক্তিদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ বাঁধিয়ে দিয়ে তাদের কারো বিষয়-সম্পত্তি হস্তগত করার চেষ্টা ছাড়া তাঁর অন্য উপায় ছিল না। এ কাজ তার পক্ষে কিছুমাত্র কষ্ট-সাধ্যও ছিল না। কারণ তিনি দেখলেন যে ভেনেসিয়ানরা, তাদের নিজেদের মতলব সিদ্ধির জন্যেই ফরাসী রাজকে ইটালীতে ডেকে আনতে চায়। সে অবস্থায় তিনি যদি বাধা না দিয়ে, বরং ফরাসী রাজের আগমনের সুবিধাই করে দেন তার পূর্ব্ব বিবাহ-বন্ধন ছেদনের অনুমতি দিয়ে, তাহলেই কার্য্যোদ্ধার হোয়ে যাবে কলেকৌশলে। ফলে ফরাসী রাজ ইতালীতে এলেন পোপ আলেকজেণ্ডারের অনুমতি নিয়ে ভেনেসিয়ানদের সাহায্যের জন্যে। ফরাসী রাজ মিলানে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই পোপ তার কাছ

থেকে সৈন্য সাহায্য চেয়ে নিলেন রোমাগ্‌না অধিকারের জন্যে। রোমাগ্‌না ফরাসী সৈন্যের নাম শুনে বিনা যুদ্ধেই পরাজয় স্বীকার করে নিলে। ফলে কোলোন্নেসীদের দর্প চূর্ণ হোলো ও রোমাগ্‌না ডিউকের হাতে এলো। ডিউক সেখানে নিজের আসন শক্ত করে নিয়ে আরো রাজ্য বৃদ্ধির জন্যে উদ্যোগী হোলেন। কিন্তু সে পথে তিনি দুটি মস্ত বড় বাধা দেখালেন। প্রথমতঃ তাঁর নিজের সঙ্গীয় সৈন্যদের তিনি ততটা বিশ্বাসী বলে মনে করতে পারেন নি। দ্বিতীয়তঃ ফরাসী রাজের সদিচ্ছা ও মর্জ্জির উপরে তাঁর বিশেষ ভরসা ছিল না। তাঁর আশঙ্কা হোলো যে, এতদিন তিনি যে ওরসিনিদের সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করেছেন, তারা হয়তো আর তাঁর হয়ে লড়তে রাজি হবে না। শুধু তা-ই নয়। তিনি নিজের অধিকার ও আধিপত্য বাড়াবার চেষ্টা করলে, তাতে তারা বাধা তো দেবেই,—অধিকন্তু তিনি যে সব সম্পত্তি হস্তগত করেছেন, সুবিধা পেলে তা-ও হয়তো তারা দখল করে বসবে। ফরাসী রাজ সম্বন্ধেও তার সেইরূপ আশঙ্কাই হয়েছিল। ফায়েন্‌জা অধিকার করে যখন তিনি বোলোগ্‌না আক্রমণ করেন, তখন ওর্‌সিনির লোকজনেরা অতি অনিচ্ছার সহিত তাঁর সঙ্গে গিয়াছিল। সেই ব্যাপারেই তিনি তাদের মনের অবস্থা টের পেয়েছিলেন। ফরাসী রাজের মনও তিনি বুঝেনিয়েছিলেন তখনই, যখন তিনি উরবিনোর জমিদারী অধিকার করে তাস্কানি আক্রমণ করেছিলেন ও ফরাসী রাজের কথায় তাস্কানি-জয় অসম্পূর্ণ রেখেই চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাই তিনি মনে মনে ঠিক করে নিলেন যে, এর পর থেকে আর তিনি অন্যের অস্ত্রবলের উপর নির্ভর করে নিজের ভাগ্য অপরের ভাগ্যের সঙ্গ জুড়ে দেবেন না।

প্রথমে তিনি ওরসিনি ও কলোন্নেসী দল দুইটা যাতে দুর্ব্বল-শক্তিহীন

হয়ে পড়ে, তার ব্যবস্থা করলেন। অভিজাত সম্প্রদায়ের যে সব লোকেরা তাদের দলে ছিল, তিনি তাদের প্রত্যেকের জন্যে প্রচুর ভাতার ব্যবস্থা করে ও প্রত্যেককে তার স্বকীয় বংশ-মর্য্যাদার অনুরূপ উপযুক্ত সরকারী পদ বা চাকুরীতে নিযুক্ত ক'রে, নিজের পক্ষপাতী ও দলভুক্ত করে তুললেন। ফলে কয়েক মাসের মধ্যেই দুই দলেরই অভিজাত-বংশীয়গণ যে যার দল ছেড়ে দিয়ে ডিউকের দলে এসে যোগ দিল। এর পরে তিনি এক সুযোগে কলোন্না বংশের পক্ষপাতী সাধারণ লোক-জনদিগকে জোর করে' তাড়িত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করে' দিয়ে ওর্‌সিনিদেরও ধ্বংস করবার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। সুযোগ আসতেও দেরী হোলো না এবং সেই সুযোগকে উপযুক্ত কাজে লাগাতেও তিনি কসুর করলেন না। ওর্‌সিনিরা যখন ভাল করেই বুঝলো যে ডিউক ও চার্চ্চের শক্তি বৃদ্ধি করা মানে নিজেদের পায়েই কুঠার মারা, তখন তারা ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য স্থির করবার জন্য নিজেদের দলের লোকজন ও সমর্থনকারীদের নিয়ে পেরুগিয়ার মাগিয়োনেতে এক সভা ডাকলো। এ থেকে উরবিনোতে বিদ্রোহ ও রোমাগ্‌নাতে অশান্তি উপস্থিত হোল। ডিউক মহা বিপদে পড়লেন, কিন্তু ফরাসী রাজের সাহায্যে তিনি সমস্ত বিদ্রোহ দমন করে বিপদ কাটিয়ে উঠলেন। নিজের আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার পরে তিনি দেখলেন যে এর পরেও যদি তিনি ফরাসীরাজ বা বাইরের আর কারো উপর নির্ভর করে থাকেন, তবে আবার যে কোন মুহূর্ত্তে তিনি মহা বিপদে পড়তে পারেন। এই সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে তিনি এক কৌশল অবলম্বন করলেন। ডিউক নিজের মনের কথা গোপন রেখে—এবং এবিষয়ে তার জুড়ি মেলা ভার—সিগ্‌নর পায়োলোর মধ্যস্থতায় ওর্‌সিনিদের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে ফেলবার চেষ্টা

করতে লাগলেন। এ কথা অবশ্যি বলাই বাহুল্য যে টাকা-পয়সা, সাজ-পোষাক, ভাল ঘোড়া ইত্যাদি উপহার দিয়ে ডিউক পূর্ব্বেই পায়োলোকে জয় করে নিয়েছিলেন। পায়োলোর চেষ্টার ফলে সিনিগালিয়াতে ওর্‌সিনিরা সরল মনে ডিউককে বিশ্বাস করে' তার হাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করল (৩১ শে ডিসেম্বর ১৫০২ সাল)। এই ভাবে দলপতিদের উচ্ছেদ সাধন করে ও তাদের দলবল কৌশলে হাত করে নিয়ে ডিউক সমগ্র রোমাগ্‌না ও উরবিনোতে তাঁর শাসন যে সুদৃঢ় ভিত্তির উপরেই স্থাপন করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর শাসনের গুণে সাধারণ লোকদেরও যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হ'তে লাগলো। ফলে দেশের সকলেই তার পক্ষপাতী হয়ে উঠলো। এই বিষয়টা সকলেরই ভাল করে বুঝে রাখা উচিত, যেহেতু এ সম্বন্ধে ডিউকের আচরণ সর্ব্বথা অনুকরণযোগ্য। তাই এ সম্বন্ধে আমি আরও বিশদভাবে আলোচনা করতে চাই। ডিউকের পূর্ব্বে রোমাগ্‌নার যারা মালিক ছিল, তারা একদিকে যেমন নিতান্ত শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল, অপরদিকে তেমনি শাসনের নামে প্রজাদের শোষণ করাই তাদের একমাত্র কাজ হোয়ে উঠেছিল। প্রজাদের মধ্যে মিল-মিশ বা একতার নামগন্ধও ছিল না এবং চুরি-ডাকাতি, ঝগড়া-ঝাটি ও খুন-জখম দেশের সর্ব্বত্র নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তাই ডিউক দেখলেন যে দেশে যদি শাসন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হয়, তাহলে একজন খুব উপযুক্ত লোককে দেশের শাসনকর্ত্তা করে বসান দরকার। তদনুসারে তিনি রেমেরো দি অরকো নামক একজন চতুর ও নির্ম্মম প্রকৃতির লোককে নিম্নপদ থেকে উন্নীত করে সুপ্রচুর ক্ষমতা দিয়ে রোমাগ্‌নায় পাঠালেন। এই নূতন শাসনকর্ত্তা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা

স্থাপন করিতে সমর্থ হোলো। এই সময়ে ডিউকের মনে হোলো যে এত অতিরিক্ত ক্ষমতা একজন লোকের হাতে বেশী দিন ন্যস্ত করে রাখা ঠিক নয়। কেন না তার অনেকদিনের যথেচ্ছচারিতার ফলে ক্রমে ডিউকই যে সকলের অপ্রিয়ভাজন ও ঘৃণার পাত্র হয়ে পড়বেন, তাতে তাঁর নিজের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। তাই যথেচ্ছচারিতার অত্যাচার বন্ধ করার জন্যে তিনি এক আদালত স্থাপন করলেন। একজন নাম করা উপযুক্ত লোক বেছে বিচারক করে বসান হোলো এবং এই আদালতের কাজ যাতে ভালরূপে সম্পন্ন হোতে পারে, সে জন্যে প্রত্যেক নগরেরই প্রতিনিধি নিযুক্ত হোলো। এর পরে ডিউক ভাবলেন যে ভবিষ্যতের জন্যে তো ব্যবস্থা করা হোলো, কিন্তু পূর্ব্ব অত্যচারের জন্যে লোকে যে তার উপরেই ঘৃণা ও অসন্তোষ পোষণ করেছে, তার প্রতিকার কি করা যায়? তাঁর মনে হোলো, এমন যদি কিছু করা যায়, যাতে লোকেরা বোঝে যে, অত্যাচার যা হয়েছে, তা শাসনকর্ত্তার নিজের নিষ্ঠুর স্বভাবের জন্যেই হয়েছে—ডিউকের তাতে কোন সায় ছিল না, তাহলে তিনি সহজেই আবার জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একদিন হঠাৎ রামিরোকে গ্রেপ্তার করে ফাঁসি কাষ্ঠে লটকে দিলেন। তারপরে তার মৃতদেহ সেই কাষ্ঠফলকে লটকানো অবস্থায়, একখানা রক্তাক্ত ছোরা সঙ্গে দিয়ে সিমেনার সর্ব্বসাধারণের দর্শনীয় স্থানে রেখে দেওয়া হোলো। এই বীভৎস দৃশ্যে একদিকে যেমন মানুষ খুসীও হোলো, অপর দিকে তাদের মনে একটা ত্রাসও উপস্থিত হোলো।

এখন আবার ফেরা যাক যা বলছিলাম, সেই কথায়। ডিউক অন্যের উপর নির্ভর না করে নিজের সৈন্যদল গড়ে নিয়েছিলেন। তাই সে দিক থেকে আপাততঃ কোন ভয়ের কারণ ছিল না। তাঁর

চারিদিকের যে সব শক্তি, তার ক্ষতি করতে পারতো, যথাবিহিত ব্যবস্থার ফলে, এখন আর তাদের কিছু করবার ক্ষমতা নেই। কাজেই এখন নিজের শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করতে গিয়ে কারো কাছ থেকে যে তাঁর বিশেষ বেগ পেতে হবে, তারও কোন সম্ভাবনা নেই। তার একমাত্র ভাবনার বিষয় রইলো ফ্রান্স সম্বন্ধে কি করা যায়? তিনি জানতেন যে ফরাসী-রাজ এখন আর তাঁকে সাহায্য করতে রাজী হবেন না। কেন না, এতদিন পরে এখন তিনি বুঝতে পেরেছেন যে ডিউককে সাহায্য করে তিনি গোড়াতেই ভুল করেছেন। ডিউকও তখন থেকে, অন্য কারো সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করা যায় কিনা, তার খোঁজ করতে লাগলেন এবং ফ্রান্সের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ সকল সম্পর্ক চুকিয়ে না দিয়ে কোন রকমে মুখ রক্ষা করে চলতে লাগলেন। এই সময়ে নেপল্‌স্ রাজ্য নিয়ে স্পেনের সঙ্গে ফ্রান্সের লড়াই চলছিলো। স্পেন গায়েতা (Gaeta) অবরোধ করে বসেছিলো। চুক্তি অনুসারে ডিউকের তখন ফ্রান্সের পক্ষ নিয়ে স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ডিউক নানা অজুহাতে দেরী করতে লাগলেন। ডিউকের উদ্দেশ্য ছিল এমন ভাবে চলা, যাতে এই দুইয়ের কারো হাতের মধ্যেই গিয়ে না পড়তে হয় এবং অনায়াসেই তার উদ্দেশ্য সফল হোতেও পারতো যদি তার পিতা পোপ আলেকজেণ্ডার আর কিছু দিন বেঁচে থাকতেন।

এই ছিলো তার উপস্থিত ব্যাপারাদি সম্বন্ধে কাজের ধারা। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও তিনি আগে হ'তেই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। তিনি ভেবে দেখলেন যে প্রথমতঃ তাঁর পিতার মৃত্যুর পরে যিনি নূতন পোপ হবেন, তিনি ডিউকের পক্ষপাতী না হয়ে বরং তার পিতা আলেক্‌জেণ্ডার তাকে যতটুকু দিয়ে দিয়েছেন, তা-ও কেড়ে নেবার চেষ্টা করতে পারেন। এই

সম্ভাবনার প্রতিবিধানের জন্যে ডিউক আগে থেকেই চার প্রকারের ব্যবস্থা করে রাখা আবশ্যক মনে করেছিলেন। প্রথমতঃ যাদের সম্পত্তি তিনি জোর করে দখল করেছেন, তাদের বংশে বাতি দিতে যাতে জনপ্রাণীও বাকী না থাকে, তার ব্যবস্থা করা। উদ্দেশ্য এই যে নূতন পোপ যাতে কখনো তাদের জন্যে কিছু করার অজুহাত নিতে না পারেন। দ্বিতীয়তঃ রোমের অভিজাত সম্প্রদায়কে হাত করে রাখা, যাতে আবশ্যকমত তাদের সাহায্যে পোপের যথেচ্ছচারিতাসংযত করা যায়। এসম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। তৃতীয়তঃ যাদের দ্বারা পোপ মনোনীত হয়ে থাকে তাদের বেশী করে নিজের পক্ষপাতী ও নিজের মতাবলম্বী করে তোলা। চতুর্থতঃ তাঁর পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে এতটা শক্তি-বৃদ্ধি করে নেওয়া, যাতে তাঁর মৃত্যুর পরের প্রথম ধাক্কাটা ডিউকের নিজের চেষ্টা ও সামর্থ্যেই সামলে' নেওয়া যায়। এই চারটা কাজের মধ্যে তিন তিনটা হাসিল করে ফেলেছিলেন তার পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বেই। সম্পত্তিচ্যুত জমিদারদের মধ্যে তিনি যে কয়জনের নাগাল পেয়েছিলেন, তারা সবাই নির্ব্বংশ হয়ে গিয়েছিল। যারা এড়িয়ে গিয়েছিল, তাদের সংখ্যা এত কম যে তা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। রোমের অভিজাত-সম্প্রদায়ের সকলকেই তিনি নিজের মতাবলম্বী ও পক্ষপাতী করে নিয়েছিলেন। আর যে পুরোহিত সংঘ পোপ মনোনয়ন করে, তাদের মধ্যেও তার দলের সংখ্যাই হয়ে গিয়েছিল সব চেয়ে বেশী। নূতন সম্পত্তির সম্বন্ধে তাঁর সঙ্কল্প ছিল তাস্কানী (Tuscany) জয় করা। পেরুগিয়া (Perugia) ও পিয়োম্বিনো (Piombino) ইতিমধ্যেই তার হস্তগত হয়েছিল এবং পিসা (Pisa)ও তার তাঁবে এসে গিয়েছিল। মাঝখানে শুধু তাস্কানীই বাকী রয়ে গিয়েছিল। এই সময়ে ফরাসী রাজের সহিত কোনো

সম্পর্ক রাখা তার আর আবশ্যক ছিল না। যেহেতু ফরাসী-শক্তি ইতিমধ্যেই স্পেনীয়দের দ্বারা নেপল্‌স্ হইতে বিতাড়িত হয়েছিল এবং তার ফলে উভয় শক্তিই তার সাহায্য ও পক্ষপাতিত্ব লাভের জন্যে লালায়িত ছিল। তাই এইটেই মস্ত সুযোগ ও সুবিধার সময় মনে করে ডিউক হঠাৎ পিসা আক্রমণ করে অধিকার করে বসলেন। এর পরে লুক্কা (Lucca) ও সিয়েনা (Siena) সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় তার বশ্যতা স্বীকার করে নিলে। কতকটা ফ্লোরেন্সের উপরে ঘৃণা বশতঃ, কতকটা তাদের ভয়েও তারা ডিউককে বাধা দিতে চেষ্টা করলে না। পিতার মৃত্যুর বৎসরে ডিউক যেভাবে আপন ক্ষমতা বিস্তার করেছিলেন, তা অব্যাহত রাখতে পারলে, ফ্লোরেন্সের পক্ষেও তাকে আর ঠেকিয়ে রাখবার উপায় ছিল না। তাঁর শক্তি ও সুনাম ইতিমধ্যেই এতটা বেড়ে গিয়েছিল যে আর একটু হলেই, তিনি অন্যের কাছে সাহায্য না চেয়ে নিজের পায়ের উপরে দাঁড়িয়েই সমস্ত প্রতিকূল শক্তিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন।

পোপ আলেকজেণ্ডার রাজ্য বিস্তার করতে আরম্ভ করে', পাঁচ বছরের মধ্যেই মারা গেলেন। এই সময়ের মধ্যে ডিউক কেবল রোমাগ্‌নাতেই তার শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলতে পেরেছিলেন। এ ছাড়া আর কোন জায়গায়ই তার আধিপত্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গড়ে উঠবার অবসর পায় নি। তার উপরে আবার এই সময়ে ডিউক পরস্পর বিবদমান দুই বিরুদ্ধ শক্তির মাঝখানে অবস্থিত হয়ে মহা বিপদে পড়ে গিয়েছিলেন এবং নিজেও মরণাপন্ন পীড়ায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সাহস ও কর্ম্ম-ক্ষমতার অভাব ছিল না। তিনি জানতেন, কি করে মানুষের মন জয় করা যায়, কিম্বা কি করলে তা হারাতে হয়। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি যেরূপ সুদৃঢ় ভিত্তির

উপরে আপনার শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলেছিলেন, তাতে মনে হয় যে, দুই দুইটা বিরুদ্ধ শক্তি তার পেছনে যদি লেগে না থাকতো, কিম্বা তিনি নিজেও যদি সুস্থ, সবল থাকতেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই সব বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারতেন। তার এইরূপ বিপদের সময়েও রোমাগ্‌না তার জন্যে একমাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে' ছিল। এতেই বোঝা যায় যে সেখানে তার শাসন কিরূপ শক্ত ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়েছিল। রোমে যদিও তিনি রুগ্ন-শয্যায় মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিলেন, তবু সেখানে তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদই ছিলেন। বাগ্‌লিয়োনি, ভিটেল্লি, ওর্‌সিনিদের তখন আর রোমে আসার কোন বাধা ছিল না, কিন্তু তারা এসেও সেখানে তার বিরুদ্ধে কিছু করে তুলতে পারেনি। তখনো তাঁর প্রভাব ও আধিপত্য এতখানি ছিল যে তিনি যাকে খুসী পোপ করতে না পারলেও, যাকে তিনি চাইতেন না, তার পোপ হওয়া, তিনি অনায়াসেই ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন। কিন্তু তিনি যদি তখন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে না পড়তেন, তবে অবিশ্যি তার পক্ষে সব কিছুই অতি সহজ সোজা হয়ে যেতো। যেদিন দ্বিতীয় জুলিয়ান্ পোপ মনোনীত হন, সেদিন ডিউক আমায় বলেছিলেন যে তাঁর পিতার মৃত্যুর পরে যত রকমের বিপদ আসতে পারে, তা সবই তিনি পূর্ব্ব থেকেই ভেবে রেখেছিলেন এবং প্রত্যেকটারই প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি এইটে কখনো ভাবতে পারেননি যে তার পিতার মরণ যখন ঘনিয়ে আসবে, তখন তিনি নিজেও আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনায় অক্ষম হয়ে পড়বেন।

ডিউকের সব কাজ-কর্ম্ম বিচার করে দেখে, মোটের উপরে আমি কোনো কিছুর জন্যেই দোষ দিতে পারিনে। বরং লোকের সামনে তাঁকে আদর্শ হিসাবে ধরাই আমি ঠিক মনে করি। বিশেষতঃ যারা

হঠাৎ শুভাদৃষ্ট বশে কিম্বা অপরের সাহায্যে রাজতক্তে বসেছে, তাদের পক্ষে ডিউকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে চলা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ তিনি আগাগোড়া নিজেকে যে ভাবে চালিয়েছেন, তা তার অপূর্ব্ব মনস্বিতা ও সুদূর-প্রসারী উচ্চ লক্ষ্যের উপযুক্তই হয়েছিল। তাঁর পিতা আলেকজেণ্ডার যদি অত শীঘ্র মারা না যেতেন, কিম্বা তিনি নিজেও যদি সে সময়ে পীড়িত হয়ে না পড়তেন, তবে তাঁর মতলব যে নিশ্চয়ই সিদ্ধ হোতো, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অতএব, নবস্থাপিত রাজ্যে নূতন রাজার শাসন নিরাপদ করে' তুলতে হোলে—নব নব বন্ধুর বন্ধুত্ব লাভ করতে হোলে—ছলে কিম্বা বলে প্রতিপক্ষকে জয় করতে হোলে—কি করলে সাধারণ লোকে রাজাকে ভালবাসবে ও ভয় করবে, তা শিখতে হোলে—কি করলে সৈন্যেরা রাজার একান্ত বাধ্য ও অনুরক্ত হয়ে থাকবে, তা জানতে হোলে—সুবিধা মত রাজার ক্ষতি করার আকাঙ্ক্ষা যাদের মনে প্রবল হবার যথেষ্ট কারণ আছে, কিম্বা রাজার ক্ষতি করার শক্তি-সামর্থ্য যাদের প্রচুর আছে, তাদের করার কৌশল শিখতে হোলে—পুরাতন ব্যবস্থা বদলে দিয়ে তার জায়গায় নূতন ব্যবস্থা কায়েম করতে হোলে—কি করে একই সময়ে কড়া, অথচ সদয়, মহানুভব ও উদার বলে পরিচিত হওয়া যায়, তা বুঝতে হোলে—বিদ্রোহী-ভাবাপন্ন সৈন্যদলকে ধ্বংস করে' নূতন সৈন্যদল গড়ে তুলতে হোলে—রাজন্যবর্গের সঙ্গে কিরূপ ভাবে বন্ধুত্ব রক্ষা করে চললে তারা উৎসাহের সঙ্গে সাহায্য করবে এবং বিরুদ্ধে দাঁড়াতে একশ' বার ইতস্ততঃ করবে', তা জানতে হোলে, সকলেরই ডিউকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত। এমন চমৎকার দৃষ্টান্ত আর কোথাও খুঁজে পাওয়া ভার।

তাঁর একটামাত্র ভুল দেখানো যেতে পারে। তা হচ্ছে দ্বিতীয় জুলিয়াসকে পোপ পদে মনোনয়ন করা সম্বন্ধে। জুলিয়াসের মনোনয়নে

সম্মতি দেওয়া তাঁর সত্যিই মস্ত বড় ভুল হয়েছে। কারণ, পূর্ব্বেই বলেছি যে তিনি খুসীমত যে কোন লোককে পোপের আসনে বসাতে না পারলেও, যাকে তিনি চাইতেন না, এমন লোকের মনোনয়ন তিনি অনায়াসেই ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন। তাই এমন কোনো লোকের মনোনয়নে তাঁর রাজি হওয়া উচিত হয়নি, পূর্ব্বে যার কোনো দিন তিনি অনিষ্ট সাধন করেছেন, কিম্বা পোপ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরে যার পক্ষে ডিউককে ভয় করে চলার যথেষ্ট কারণ আছে। মানুষ একজন আর একজনের ক্ষতি করে—ভয়ে কিম্বা ঘৃণায়। ডিউকের রাজ্য স্থাপনের ফলে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে সান পিয়েত্রা আদ্ ভিঙ্কুলা (San Pietra Ad Vincula), কোলোন্না (Colonna), সান জিয়োর্জ্জিয়ো (San Giorgio) ও আস্কানিয়োর (Ascanio) লোকসানও কম হয়নি। এছাড়া আর যারা পোপ পদপ্রার্থী ছিল, পোপ হোলে পরে তাদের প্রত্যেকেরই ডিউককে ভয় করে চলার যথেষ্ট কারণ ছিল। কেবল ফ্রান্সের অধিবাসী রুয়াঁ (Rouen) ও স্পেনিস্ পদপ্রার্থীদের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। ডিউকের উপরে তাদের ঘৃণাও ছিল না, তাকে ভয় করে চলারও কোন হেতু ছিল না। ডিউকের সঙ্গে স্পেন রাজশক্তির বাধ্য-বাধকতার সম্পর্ক ছিল।

রুয়াঁও ফরাসী-রাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ থাকায় সর্ব্বদা তার সাহায্যের উপর নির্ভর করতে পারতো। তাই, তাদের কারো পক্ষেই ডিউককে ভয় করে' চলার কোন কারণ ছিল না। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে সব চেয়ে ভাল কথা হোতো যদি তিনি স্পেন-দেশবাসী কোন পদ-প্রার্থীকে পোপের আসনে বসাতে পারতেন। যদি তা নেহাৎ সম্ভব না হোতো, তাহলে অন্ততঃ পক্ষে রুয়াঁর মনোনয়নে তার সম্মতি দেওয়া উচিত ছিল। তা না করে, তিনি সানপিয়েত্রা আদ

ভিঙ্কুলার মনোনয়নে রাজি হয়ে অত্যন্ত ভুল করেছেন। বড় বড় লোক যাদের পূর্ব্ব শত্রুতার প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা আছে, নূতন সুবিধা বা সম্মান দিয়ে তাদের মন ভোলান যাবে—একথা যিনি মনে করেন, অচিরাৎ আশাভঙ্গে তাঁর মনস্তাপের পরিসীমা থাকবে না। যার তুমি অনিষ্ট করেছ, সে কখনো তোমার বন্ধু হবে না—মান-সম্মান যতই কেন দাও না, তোমার অনুগ্রহের দানে কখনো সে পূর্ব্বস্মৃতি বিস্মৃত হবে না—যখনি সুবিধা পাবে, তখনি সে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে। দ্বিতীয় জুলিয়াসের মনোনয়নে সম্মত হয়ে ডিউকও এই ভুলই করেছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাতেই যে তাঁর সর্ব্বনাশ ঘটলো, তা কে না জানে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

"শয়তানী করে কেড়ে নিয়ে জুড়ে বসা রাজ্য"

আরো দুই প্রকারের উপায় আছে, যাতে করে কোন ব্যক্তি বিশেষ সাধারণ অবস্থা থেকে রাজাসনের অধিকারী হতে পারেন। যদিও এ দুয়ের কোনোটাকেই পূরোপূরি দৈব বা পুরুষকারের পথ বলা চলে না, তবুও এ সম্বন্ধে একেবারে নীরব থাকা আমার পক্ষে ঠিক হবে না। তবে এর মধ্যে একটা উপায় সম্বন্ধে আলোচনা এখন সুবিধা হবে না—পরে যখন গণতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা উঠবে, তখন করা যাবে। এই দুই উপায়ের এক উপায় হচ্ছে—পাপাচারমূলক অতি দূষিত কুৎসিত উপায়ে রাজ্য লাভ করা, দ্বিতীয় হচ্ছে দেশের জন-সাধারণের পোষকতায় ও প্রীতির বলে সাধারণ অবস্থা থেকে দেশের রাজাসনের মালিক হওয়া। প্রথম উপায় সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য, তা দুটি উদাহরণ দিয়ে বলতে চাই—একটি প্রাচীন ইতিহাসের ও আর একটি বর্ত্তমান ইতিহাসের পাতা থেকে। যারা এইরূপ উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হবে, আমার বিশ্বাস, এই দুইটি উদাহরণই তাদের বুঝবার পক্ষে যথেষ্ট হবে।

সিসিলীর আগাথোক্ল্স্ (Agathocles) সিরাকিউসের রাজা হয়েছিলেন। তিনি যে অবস্থা থেকে রাজা হয়েছিলেন, তাকে

শুধু সাধারণ অবস্থা বললে যথেষ্ট হয় না—সে ছিল নিতান্ত দীন-হীন অবস্থা। তিনি একে তো ছিলেন সামান্য একজন কুম্ভকারের পুত্র, তার উপরে আবার তাঁর জীবনের সমস্ত উঠা-নামার ভিতরে চিরদিনই তার ব্যক্তিগত জীবন ছিল অতিশয় কুৎসিত। অথচ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত কদর্য্যতা সত্ত্বেও তার শরীর ও মনের ক্ষমতা ছিল সুপ্রচুর এবং সেজন্যই সামরিক বিভাগে ঢুকে নিজের যোগ্যতা বলে তিনি সামান্য পদ থেকে ক্রমে সিরাকিউসের প্রীটর (Praetor) পদে উন্নীত হয়েছিলেন; কিন্তু এই পদে অধিষ্ঠিত হয়েও তিনি খুসী হলেন না। যে পদ ও ক্ষমতা বজায় রাখতে তাঁকে অন্যের মর্জ্জির উপরে নির্ভর করতে হয়, তা নিজের ক্ষমতায় অর্জ্জন করতে তিনি বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। কারো উপর নির্ভর না করে নিজের শক্তিতে দেশের রাজা হয়ে বসাই তার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো। এই সময়ে আফ্রিকার কার্থেজ নিবাসী হামিলকার (Hamilcar) সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এসে সিসিলী আক্রমণ করেছিলেন। আগাথোক্‌ল্‌স্‌ নিজের মতলব সিদ্ধির উদ্দেশ্যে হামিলকারের সঙ্গে গোপনে এক সাময়িক সন্ধির ব্যবস্থা করলেন। তারপরে গণতন্ত্র সম্পর্কিত বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনার অজুহতে, একদিন সকালে তিনি দেশের গণ্যমান্য লোকদের ও সিরাকিউস শাসন পরিষদের সদস্যগণকে ডেকে পাঠালেন। হঠাৎ এক সঙ্কেত-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সৈন্যেরা সে সভায় ঢুকে পারিষদবর্গকে ও দেশের অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকে মেরে ফেললে। এর পরে আর কোন গণ্ডগোল রইলো না—তিনি নির্ব্বিবাদে দেশের রাজা হয়ে বসলেন। এরপর পরাক্রান্ত কার্থেজবাসীদের সঙ্গে তার আবার যুদ্ধ চলতে লাগলো —দুই দুই বার যুদ্ধে তাঁকে হটেও আসতে হোল এবং অবশেষে তারা

সিরাকিউস অবরোধ করে বসলো। তবু শেষ পর্য্যন্ত তারা তাঁকে পরাস্ত করতে পারে নাই। তিনি যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে নগর রক্ষার ব্যবস্থা করে' সৈন্যদলের এক ভাগ মাত্র দেশ রক্ষার জন্যে রেখে, বাকী আর সবাইকে নিয়ে তিনি নিজে আফ্রিকায় যেয়ে হামিলকারের নিজের দেশ আক্রমণ করলেন। ফলে অল্পকালের মধ্যেই কার্থেজবাসীরা সিরাকিউস অবরোধ পরিত্যাগ করে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হল। কার্থেজবাসীরা উল্‌টো বিপদে পড়ে আগাথোক্‌ল্‌স্‌এর সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হল। ফলে সিসিলীর আশা ছেড়ে দিয়ে আফ্রিকার অধিকার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা ছাড়া কার্থেজবাসীদের আর কোন উপায় রইলো না।

অতএব এই লোকটির প্রতিভা ও কার্য্যাবলী বিচার করে দেখা যায় যে এর যা-কিছু কীর্ত্তি কোনোটাকেই নেহাৎ দৈব বা ভাগ্যের দান বলে নির্দ্দেশ করা যায় না। এর ভিতরে দৈবের হাত কিছুমাত্র থাকলেও তা এত সামান্য যে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। সে যে বড় হয়েছে, তা কারো খুসীর উপরে নির্ভর করে নয়—হয়েছে সম্পূর্ণভাবে নিজেরই চেষ্টায়। সামরিক বিভাগে ঢুকে প্রতিপদে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে নানা দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়ে তাকে ধাপে ধাপে উপরে উঠতে হয়েছে—ক্রমে সর্ব্বোচ্চ পদ লাভ করে বহু বিপদ বাধার ভিতর দিয়ে জোরজবরদস্তি চালিয়ে সে পদ অব্যাহত রাখতে হয়েছে। অথচ তার মত এরূপ মানুষ হত্যা করা—বন্ধুস্থানীয়দের সঙ্গে প্রতারণা করে—লোকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করাকে সদ্‌বুদ্ধির কাজ বলা যেতে পারে না। এরূপ উপায়ে রাজ্য লাভ হতে পারে, কিন্তু তাতে গৌরব নেই। তবু বার বার বিপদে পড়ে তার বেড়া-জাল কাটিয়ে বেড়িয়ে আসার সাহস ও নানা দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়ে তাকে জয় করে এগিয়ে যাবার মনের

বল তার যা ছিল, তা দেখে তাকে সুপ্রসিদ্ধ অধিনায়কদের চেয়ে কম মনে করা যায় না। তবু তার বর্ব্বরোচিত নিষ্ঠুরতা, অমানুষিক অত্যাচার ও অপরিসীম পাপাচারের ফলে মনীষা সম্পন্ন সুধী-ব্যক্তিদের সঙ্গে তাকে এক পঙক্তিতে ফেলা যায় না। তাই তার যা কৃতিত্ব, তাকে দৈব বা পুরুষকারের দান বলে গ্রহণ করা যায় না।

অপর দৃষ্টান্তটি বেশী দিনের কথা নয়। তখন ষষ্ঠ আলেকজেণ্ডারের রাজত্বকাল। ওলিভারোটো ডা ফারমো (Oliverotto da Fermo) নামক এক ব্যক্তি এমনি পাপাচার অবলম্বন করে ফারমোর রাজা হয়ে বসেছিল। অল্প বয়সেই তার বাপ মা মরে যায়। তার মাতুল গিয়োভানি ফোগ্‌লিয়ানির (Giovanni Fogliani) আশ্রয়ে সে লালিত পালিত হতে থাকে। বালক যুবক হয়ে উঠছে দেখে তিনি তাকে পায়োলো ভিটেল্লীর (Paolo Vitelli) কাছে যুদ্ধ বিদ্যা শিখতে পাঠিয়ে দেন। তার আশা ছিল যে পায়োলের মত একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোকের শিক্ষায় ও শাসনে অলিভারোটো একদিন সামরিক বিভাগে কোন উচ্চ পদে কায়েম হতে পারবে। কিছুদিন যেতে না যেতে পায়োলা মরে গেল। তারপরে তার ভাই ভিটেল্লোজোর (Vitellozzo) অধীনে অলিভারোটো কাজ করতে লাগলো। অটুট স্বাস্থ্য, সুদৃঢ় মন ও শানিত বুদ্ধির জোরে সে অল্প সময়ের মধ্যেই যুদ্ধ-বিদ্যায় প্রথম স্থান পেয়ে গেল। তখন তার মনে হোল, অন্যের অধীনে চাকুরী করা বড় তুচ্ছ কাজ। তাই সে মতলব পাকালো যে ভিটেল্লি (Vitellis) বংশের সহায়তায় ফারমো দখল করবে। ফারমোর অধিবাসী কতিপয় ব্যক্তিও তাকে সাহায্য করতে রাজি হোলো। তাদের কাছে স্বদেশের স্বাধীনতা থেকে পরাধীনতাই বেশী প্রিয় ছিল—তাই তাদের কোন দ্বিধার বালাই ছিল না। মতলব মত সব ব্যবস্থা পাকা করে

তুলে অলিভারোটো তার মাতুলকে এক চিঠি লিখে দিলে। লিখলে যে অনেক বছর হয়ে গেল, সে বাড়ী আসতে পারে নি—এইবারে তাদের সকলের সঙ্গে দেখা করার জন্য তার মনটা বড়ই উদ্‌গ্রীব হয়েছে। তা ছাড়া তার পৈতৃক সম্পত্তির একটা বিলি-ব্যবস্থা করাও আবশ্যক। যদিও এতদিনের পরিশ্রমের ফলে শুধু সম্মান তার আর কোনো লভ্য হয়নি তবুও সে যে এত দিন বৃথাই নষ্ট করেনি, সেইটে সবাইকে সে দেখাতে চায়। তাই সে তার সম্মানের পরিপোষক স্বরূপ তার বন্ধুবান্ধব ও অনুচরবর্গের ভিতর থেকে এক শত ঘোড়সোয়ার সঙ্গে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছে। তার অনুরোধ গিয়োভান্নী যেন ফারমোবাসীদের নিয়ে তার সসম্মান অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেন। তিনিও তো তাকে প্রতিপালন করেছেন! তাই তার সম্মানে গিয়োভান্নীর নিজেরই সম্মান বাড়বে।

তারপরে এক দিন অলিভারোটো সদলবলে ফারমো নগরে এসে উপস্থিত হোলো। গিয়োভান্নী তার ভাগনের সম্মানের জন্যে যা দরকার সবই করলেন—কোথাও কোনো ত্রুটি রাখলেন না। ফারমোর অধিবাসীরাও তাকে যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা করলে। গিয়োভান্নী তাকে তার নিজের গৃহেই স্থান করে দিলেন। অলিভারোটো সেখানে কয়েক দিন থেকে ও তার পাপ-মতলবের সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেলে, একদিন সে গিয়োভান্নী ও ফারমোর অন্যান্য প্রধান নাগরিকদের নিমন্ত্রণ করে এনে এক প্রীতি ভোজের ব্যবস্থা করলে। ভোজ সুরু হোলো—খাওয়া দাওয়া চলতে লাগলো। ক্রমে সব শেষ হয়ে গেল। এই উপলক্ষে আর যে সব আনন্দের আয়োজন হয়েছিল, সব শেষ হোতে অলিভারোটো কৌশলে এক গুরুতর বিষয়ের আলোচনা তুললে। পোপ আলেকজেণ্ডার ও তাহার পুত্র সিজারের শ্রেষ্ঠত্ব

ও দুঃসাহসিক কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে সে তার অভিমত জানালে। গিয়োভান্নী ও অন্যান্য সবাই তার জবাব দিলে। হঠাৎ অলিভারোটো দাঁড়িয়ে উঠে বললে যে এমন প্রকাশ্য স্থানে এরূপ গুরুতর কথার আলোচনা হওয়া উচিত নয়। এই বলে সে গিয়োভান্নী ও অন্যান্য সকলকে এক নিভৃত কামরায় নিয়ে এসে বসালো। কিন্তু তারা সেখানে এসে বসতে না বসতেই গুপ্ত স্থান থেকে সৈন্যেরা বেরিয়ে এসে গিয়োভান্নী ও অন্যান্য সকলকে হত্যা করলে। এর পরে অলিভারোটো সহরের এ-ধার থেকে ও-ধার অবধি ঘোড়ায় চড়ে ঘোরা-ফেরা করতে লাগলো। প্রধান মেজিষ্ট্রেটকে তাহার কুঠিতেই অবরোধ করে রাখলে। ফলে সাধারণ লোকেরা ভয়েই তাকে মেনে নিলে এবং তার কথা মত তাকেই দেশের রাজা করে বসালে। যারা মনে মনে অসন্তোষ পোষণ করতে লাগলো, তাদের মধ্যে যাদের সম্বন্ধে তার মনে হোলো যে ক্ষতি করবার ইচ্ছা থাকলে করতে পারবে, তাদের সে হত্যা করে ফেললে। তা ছাড়া নূতন নূতন সাধারণ ও সামরিক নূতন নূতন বিধি ব্যবস্থা কায়েম করে তার রাজত্বের বনিয়াদ পাকা করে তুললে। ফলে যত দিন সে ফারমোতে, রাজত্ব করেছে সে তো নিরাপদই ছিলই, তার আসে পাশে যে সব রাজার রাজ্য ছিল, তারাও তার ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকতো—তার কোনো ক্ষতি করার কথা মনেও আনতে সাহস করতো না। কিন্তু নানা যোগাযোগের ফলে এক বৎসরের মধ্যেই যে তার রাজত্বের মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছিল, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। সিনিগালিয়াতে (Sinigalia) অরসিনী ও ভিটেল্লীর সঙ্গে গিয়ে সে সিজার বর্জ্জিয়ার ফাঁদের ভিতরে নিজেকে ধরা দিয়ে অত্যন্ত ভুল করেছিল। তা না হলে, আগাথোক্লস্ এর মতই তার সর্ব্বনাশ সাধন করাও কারো পক্ষেই সহজ হোতো না। নিজের

মাতুলকে হত্যা করার এক বৎসরেরই মধ্যেই সে নিজেও নিহত হোলো। যে ভিটেল্লোজোকে সে তার যুদ্ধ বিদ্যা ও পাপাচরণ—উভয়েরই গুরু করে' নিয়েছিল, সেও তার অবস্থাই প্রাপ্ত হোলো।

অনেকে হয়তো আশ্চর্য্য হবেন, এই ভেবে যে এমনটা কি করে সম্ভব হয়? আগাথোক্ল্স এবং তার মত আরো কেউ কেউ অশেষ নৃশংসতা ও অপরিসীম বিশ্বাসঘাতকতা করেও, তার পরে অনেক দিন ধরে নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করেছে—দেশের কেউ কখনো তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেনি—বহিরাক্রমণের হাত থেকেও তারা অনায়াসেই আপনাদিগকে রক্ষা করেছে! অথচ এমন অন্য অনেকের সম্বন্ধে দেখা গিয়েছে যে যুদ্ধের বিশৃঙ্খল অনিশ্চয়তার দিনের তো কথাই নাই—নিতান্ত শান্তির সময়েও তারা নিষ্ঠুর অত্যাচারের দ্বারা রাজত্ব রক্ষা করতে পারে নি। কিন্তু আমি মনে করি যে এরূপ ক্ষেত্রে সফলতা-বিফলতা নির্ভর করে কড়া ব্যবস্থা ঠিক ঠিক ভাবে প্রয়োগ করতে পারা না পারার উপরে। অত্যাচার যদি করতেই হয়, তবে পূরোপূরি নির্ব্বিঘ্ন হওয়ার জন্যে যতটুকু দরকার, ঠিক ততটুকুই করতে হবে—তার এক কড়াও বেশী নয় এবং তা-ও থেকে থেকে, বার বার করে' না করে', এক বারেই সব নিঃশেষে করে ফেলতে হবে। পরে আর কখনই সেরূপ আচরণ পুনরায় করা ঠিক নয়—যদি না, তাতে করে প্রজা-সাধারণেরই উপকার হবে—এরূপ দেখানো যায়। এই ভাবে অত্যাচারমূলক কড়া ব্যবস্থার প্রয়োগকে সুষ্ঠু প্রয়োগ বলা যেতে পারে, যদিও এরূপ অন্যায় আচরণ সম্বন্ধে 'সুষ্ঠু' কথাটা ব্যবহার করা হয়ত রীতি বিরুদ্ধ হল। আর সেই ভাবে প্রয়োগকে অপ-প্রয়োগ বলবো, যাতে গোড়ায় অত্যাচার যতই কম হোক, যত দিন যায় ক্রমে তার পরিমাণ বেড়েই চলে—কমিয়ে আনবার নামটিও করে না। যারা

প্রথমোক্ত পথ অবলম্বন করে, তারা ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই হোক, কিম্বা মানুষের সহায়তাই হোক, তাদের শাসন কতকটা সহনীয় করে তুলতে পারে—যেমন আগাথোক্‌ল্‌স পেরেছিল। কিন্তু যারা শেষোক্ত পথ অনুসরণ করে, তাদের পক্ষে নিজেদের শাসন-কর্ত্তৃত্ব বেশি দিন অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব।

অতএব যে জোরজার করে কোনো রাজ্য দখল করে তাকে খুব ভেবে চিন্তে কাজ করতে হয়। প্রথমে তার খুব ভাল করে ভেবে দেখা উচিত যে কার কতটুকু ক্ষতি করা তার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। তারপরে, যা করতে হবে, একবারেই সব শেষ করে ফেলা চাই—যেন দিন দিন তেমন কাজ আর বারে বারে না করতে হয়। এর ফলে পরে আর দিনের পর দিন নূতন নূতন আশঙ্কার কোনো কারণ ঘটবে না বলে, মানুষের মন ক্রমে অনেকটা সুস্থ শান্ত হয়ে আসবে। তখন যথাযোগ্য পুরস্কার ও সুবিধা দান করে সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে তাদের মন জয় করে নেওয়া যেতে পারবে। যে মনের দুর্ব্বলতার বশে কিম্বা পরামর্শদাতার কুপরামর্শে এই পথ না নিয়ে অন্য পথ নিবে, তাকে সব সময়ে ছুরিকা উদ্যত করে চলতে হবে। সে নিজেও কখনো প্রজাদের উপরে নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হতে পারবে না, প্রজারাও বার বার তার হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে কখনই তার অনুরক্ত হবে না। ক্ষতি যদি করতেই হয়, তবে তার সবখানি একবারেই করে ফেলতে হবে; তাতে তিক্ততার স্বাদ পাবে কম—ফলে অসন্তোষও ক্ষণস্থায়ী হবে; কিন্তু অনুগ্রহের দান একবারে সব নিঃশেষ না করে, অল্প অল্প করে তা বণ্টন করতে হয়। তাতে সে দানের সুবাস দীর্ঘস্থায়ী হয়।

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, রাজা তার প্রজাদের ভিতরে বাস করে এমন ভাবে দেশের শাসন চালাবে, যেন সুদিনে কিম্বা দুর্দ্দিনে—কখনই

তার ব্যবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন আবশ্যক না হয়। যেহেতু দুঃসময়ে পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়ে পড়ে, তবে তখন আর কিছু করারই সময় থাকবে না। কড়া ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন তখন অসম্ভব,—অথচ নরম ব্যবস্থাও তোমার কোনো কাজে আসবে না। লোকে মনে করবে যে তুমি নিজের খুসীতে তা করোনি—তোমার কাছ থেকে তা জোর আদায় করা হয়েছে। তাই কেউই তার জন্যে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা আবশ্যক মনে করবে না।

নবম পরিচ্ছেদ

পৌর রাষ্ট্র

এখন অপর বিষয়টির কথা, যেটির আলোচনা মুলতুবি রাখা হয়েছে পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে। বিষয়টি হচ্ছে, যেখানে কোন নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিক অত্যাচার ও পাপাচরণের ফলে রাজা না হয়ে, দেশের সাধারণের ইচ্ছায় ও অনুরোধে রাজা হন, বিষয়টি হচ্ছে সেই সম্বন্ধে। এরূপ রাষ্ট্রকে বেসামরিক পৌর রাষ্ট্র বলা যেতে পারে। এইভাবে রাজা হতে সম্পূর্ণভাবে পুরুষকার বা দৈববলের প্রয়োজন হয় না—মোটামুটি ভাবে একটা সুষ্ঠু সূক্ষ্ম বুদ্ধির সঙ্গে সামান্য দৈবের সাহায্য থাকলেই চলতে পারে। আমার মতে দুই ভাবে রাজ্য লাভ হতে পারে। এক দেশের সাধারণ লোকদের অনুগ্রহে, না হয় তো অভিজাত সম্প্রদায়ের অনুকূলতায়। দেখা যায় প্রত্যেক নগরেই লোকেরা এই দুই দলে বিভক্ত। আবার সাধারণ লোকেরা কোথাও অভিজাত সম্প্রদায়ের শাসন ও অত্যাচার মাথা পেতে নিতে রাজি নয়, কিন্তু অভিজাত সম্প্রদায় সর্ব্বত্রই তাদের উপর নিজেদের শাসন ও অত্যাচার কায়েম করে রাখতে চায়। দুই দলের এইরূপ বিরুদ্ধ ইচ্ছার সংঘর্ষের ফলে প্রত্যেক নগরেই শাসন ব্যবস্থা নিম্নলিখিত তিন প্রকারের যে কোনো এক প্রকার হয়ে দাঁড়ায়—(১) রাজ শাসন (২) স্বায়ত্ত্ব শাসন কিম্বা (৩) ঘোর অরাজকতা।

জন-সাধারণ এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদে যারাই সুবিধা পাবে, তারাই রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে। অভিজাত সম্প্রদায় যখন দেখে যে জনসাধারণের সঙ্গে পেরে উঠছে না, তখন তারা তাদের একজনকে বড় করে তোলে ও সকলে মিলে তার গুণ গাইতে থাকে সবার কাছে। অবশেষে তাকেই তাদের রাজা করে বসায়। আশা করে যে তাকে সামনে রেখে নিজেরা নীচে কাজ করে তাদের মতলব হাঁসিল করে তুলতে পারবে। সেইরূপ জনসাধারণের দলও যখন দেখে যে অভিজাত সম্প্রদায়কে আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না, তখন তারাও তাদের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নিয়ে সকলে মিলে তার গুণগান সুরু করে দেয় ও তাকেই রাজা করে বসায় এই আশায়, যে অভিজাত সম্প্রদায়ের হাত থেকে এই রাজাই তাদের রক্ষা করবে। জন-সাধারণের সাহায্যে রাজা হলে রাজত্ব রক্ষা করা যত সহজ অভিজাত সম্প্রদায়ের সাহায্যে হোলে, তেমন হয় না। কেননা শেষোক্ত ক্ষেত্রে রাজার যারা সাহায্যকারী, তারা প্রায় সকলেই মনে করে যে তারা রাজারই সমকক্ষই। তাই রাজা তাহাদিগকে নিজের ইচ্ছামত মতও চালাতে পারে না—শাসনও করতে পারে না। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে এমন লোক নেই, যে নিজেকে রাজার সমকক্ষ বলে মনে করতে পারে। তাই সকলেই তার কথা শুনে চলবে—অন্ততঃ যারা শুনবে না, এমন লোকের সংখ্যা মুষ্টিমেয় না হয়ে পারে না।

তা ছাড়া, অন্যের ক্ষতি না করে, শুধু উচিত ব্যবহারের দ্বারা অভিজাত সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করা যায় না; কিন্তু জনসাধারণকে খুসী করা সহজ। কেননা, জন-সাধারণের দাবী সামান্য ও সর্ব্বদা ন্যায়-সঙ্গত। কিন্তু অভিজাত-সম্প্রদায়ের তা নয়। তারা চায়, অন্যের উপর অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে। আর এক কথা, জন-সাধারণ সংখ্যায়

এত ভারী যে তারা বিরুদ্ধবাদী হয়ে দাঁড়ালে, রাজার পক্ষে সেই চাপ থেকে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। কিন্তু অভিজাত সম্প্রদায় সংখ্যায় মুষ্টিমেয় বলে তাদের শাসনে রাখা রাজার পক্ষে কিছুই শক্ত ব্যাপার নয়। জন-সাধারণ রাজার প্রতি অসন্তুষ্ট হ'লে, বড় জোর তারা রাজার পক্ষ সমর্থন না করে সরে দাঁড়াবে। কিন্তু অভিজাত-সম্প্রদায় সে অবস্থায় শুধু সরে দাঁড়িয়ে চুপ করে থাকবে না—যত রকম করে পারে শত্রুতা করবে। তারপরে, বিপদ দেখলে, সময় থাকতেই যে কোন রকমে একটা রফা করে নিয়ে নিজেদের বাঁচবার ব্যবস্থা ও রাজার অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করবে। কেননা এসব বিষয়ে তারা যথেষ্ট চতুর ও দূরদর্শী এবং তারা আশা করে যে একদিন না একদিন রাজাকে হাত করে নিয়ে নিজেদের মতলব হাসিল করতে পারবে। রাজার আরো এক কথা মনে রাখা উচিত যে তাকে চিরকাল একই জন-সাধারণের মাঝে বসবাস করতে হবে, কিন্তু অভিজাত-সম্প্রদায় সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। তিনি ইচ্ছা করলে, যে কোনো সময়ে অভিজাত-সম্প্রদায়কে ভেঙ্গে দিয়ে নূতন সম্প্রদায় গড়ে তুলতে পারেন। কেন না, কাউকে কোন অধিকার দেওয়া কিম্বা কারো হাত থেকে কোনো অধিকার কেড়ে নেওয়া—সবই তার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে।

এই বিষয়টা আর একটু পরিষ্কার করে বলি। অভিজাত-সম্প্রদায়কে দুইভাগে ভাগ করা চলে। এক, যারা এমন ভাবে চলে তাদের বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ রাজার ভাল-মন্দের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে দৃঢ়-বদ্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয়, যারা সে ভাবে চলে না। যারা নিজেদের অদৃষ্টকে রাজার অদৃষ্টের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে তার সঙ্গে এক হয়ে যায়, তারা যদি অতিলোভী না হয়, তবে তাদের ভালবাসা ও সম্মান করা উচিত। যারা সেভাবে রাজার সঙ্গে তাদের স্বার্থ এক বলে দেখে না, তাদের সম্বন্ধে কি

ব্যবস্থা করা যায়? তার দুই উপায় আছে। এক যারা স্বাভাবিক ভীরুতা ও সাহসের অভাববশতঃ রাজার সকল সংশ্রব থেকে আপনাদিগকে দূরে রাখে, তাদের দ্বারা যতটুকু কাজ করান সম্ভব, তা করিয়ে নেওয়া উচিত —বিশেষতঃ তাদের মধ্যে যারা কোন খারাপ মতলব পোষণ করে না, তাদের সম্বন্ধে তো কথাই নেই। তার ফল হবে এই যে, সুদিনের দিনে তোমার নিজেরই মান সম্ভ্রম বৃদ্ধি পাবে,—আর দুর্দ্দিনেও তাদের দিক থেকে তোমার ভয়ের কোন কারণ থাকবে না। দ্বিতীয়—যারা আপন আপন উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের আশায় তোমার সঙ্গে নিজেদিগকে বাঁধতে চায় না, তারা যে তোমার দিকে না চেয়ে নিজেদের স্বার্থের কথাই ভাবছে বেশী করে, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। এরূপ লোকদের সম্বন্ধে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত এবং সর্ব্বতোভাবে তাদের পূরোপূরি শত্রু বলেই মনে করা উচিত। কেন না বিপদের দিনে এরা' তোমার ধ্বংসেরই সহায় হবে।

অতএব, যে, জন-সাধারণের সহানুভূতির বলে রাজাসনের অধিকারী হয়, তার পক্ষে জন-সাধারণকে বন্ধু করে রাখারই ব্যবস্থা করা উচিত। আর তা করাও বিশেষ শক্ত কিছুই নয়। কারণ জনসাধারণ বিশেষ কিছুই চায় না—তারা চায় শুধু, সে যেন তাদের প্রতি অত্যাচার না করে। তা ছাড়া, জনসাধারণের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও অভিজাত সম্প্রদায়ের সাহায্যে যে রাজা হয়, তাহার পক্ষেও সব চেয়ে বেশী দরকার, জন-সাধারণকে নিজের পক্ষপাতী করে তোলা এবং তাও সে অনায়াসেই করতে পারে, যদি সে সকল অত্যাচার অবিচার থেকে জনসাধারণকে রক্ষার ব্যবস্থা করে। কারণ, মানুষ যার কাছ থেকে খারাপ ব্যবহারই আশঙ্কা করে, তার থেকে যদি ভাল ব্যবহার পায়, তবে তার প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়ে পারে না।

ফলে রাজা সহজেই জনসাধারণের এতটা প্রিয় হয়ে ওঠে যে সে জনসাধারণের সাহায্যে রাজাসন লাভ করলেও, ততটা হতে পারতো না। জনসাধারণের অনুরাগ ও সমর্থন লাভের পন্থা কতই তো আছে। কিন্তু এক এক অবস্থায় এক এক পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে কোনো নিয়ম বেঁধে দেওয়া চলে না; আমিও তাই কোনো চেষ্টাই করলুম না। কিন্তু পুনরায় আমি এই কথাটা বলতে চাই যে, সব রাজার পক্ষেই জনসাধারণের অনুরাগ ও সমর্থন লাভ করা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথা বিপদের দিনে তার যে কি অবস্থা হবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

স্পার্টানদের রাজা নাবিস (Nabis) সমগ্র গ্রীস ও বিজয়ী রোমান সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করে নিজের দেশ ও রাজত্ব রক্ষা করেছিল। এজন্যে তার যে একটা খুব বেগ পেতে হয়েছিল, তা-ও নয়। অল্প কয়েকজন লোকের সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করে সে অতি সহজেই এত বড় বিপদের মধ্যেও আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল; কিন্তু জনসাধারণ যদি তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতো, তাহলে কখনই এত সহজে সে পারতো না। কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে ‘দশের পীরিতি বালির বাঁধ’। কিন্তু এ প্রবাদবাক্য এখানে খাটে না। এ কথা খাটতে পারে একজন সাধারণ ব্যক্তিবিশেষের সময় যখন সে সাধারণের সহানুভূতির উপর নির্ভর করে মনে মনে বিশ্বাস করে যে তারা তাকে তার শত্রু কিম্বা রাজপুরুষের অত্যাচার থেকে স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে বাঁচাবে। এরূপ আশা যে করে তার সে আশা যে অনেক সময়েই অপূর্ণ থাকবে, তাতে আর সন্দেহ কি? যেমন গ্রাকীর (Gracchi) হয়েছিল রোমে ও মেসের জর্জিয়ো স্কালির (Messer Giorgio Scali) হয়েছিল ফ্লোরেন্সে, তারও সেই দশা হওয়া

অনিবার্য্য। কিন্তু একজন রাজার পক্ষে এ কথা মোটেই প্রযোজ্য নয়। বিশেষতঃ যে উপরোক্ত ভাবে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছে—যার সাহস আছে, দশজনের উপরে কর্ত্তৃত্ব করার ক্ষমতা আছে—বিপদে যে দমে যায় না অন্যান্য রাজোচিত গুণেরও অভাব নেই এবং যে নিজের দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও উদ্যমশীলতার গুণে দেশের লোকদের নির্ভয় ও নিরুদ্বিগ্ন রাখার ব্যবস্থা করতে পারে, সে কখনো জন-সাধারণের উপরে নির্ভর করে প্রতারিত হবে না। বরং তাতে সে তার রাজত্বের সৌধ যে দৃঢ় ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত করেছে, তা-ই প্রমাণিত হবে।

কোনো দেশের শাসন সাধারণতন্ত্র (Civil Government) থেকে স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হলে, তার বিপদের আশঙ্কা আছে। এরূপ স্বৈরতন্ত্রের যিনি অধিনায়ক বা রাজা, হয় তিনি নিজে উপস্থিত থেকেই সে দেশ শাসন করবেন, নয় তো কর্ম্মচারীর হাত দিয়ে তাঁকে দেশ শাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। কর্ম্মচারীর উপরে নির্ভর করতে হলে এরূপ দেশের শাসন দুর্ব্বল না হয়ে পারে না। ফলে তার যে কোনো সময়েই বিপদ ঘটতে পারে। যেহেতু এরূপ ক্ষেত্রে কর্ম্মচারীদের শুভ-বুদ্ধির উপর রাজার নির্ভর করে থাকতে হয় এবং তারা ইচ্ছা করলে, বিশেষতঃ বিপদের দিনে, অতি সহজেই তাঁর কর্ত্তৃত্বের অবসান করে দিতে পারে—তলে তলে ষড়যন্ত্র করে, কিম্বা খোলাখুলি ভাবেই কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করে। এরূপ গোলমালের সময়ে রাজার পক্ষে অবাধ কর্ত্তৃত্ব খাটানোও সম্ভবপর নয়। যেহেতু সাধারণ লোক কর্ম্মচারীদের হুকুম মেনে চলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে বলে হৈ-চৈ-এর সময় তারা রাজার কথা শুনতে রাজি হবে না। আর এরূপ সময়ে বিশ্বাস-ভাজন লোকেরও অভাব হয়ে পড়ে। শান্তির সময়ে রাষ্ট্রের যে অবস্থা দেখা যায় তার উপরে বিপদের সময় নির্ভর করা চলে না। তখন সকলেই রাজার

মতেই মত দেয়, কেন না তখন তাদের স্বার্থরক্ষার জন্যই রাষ্ট্রে রাজশাসনের আবশ্যকতা অনুভব করে। তখন যা বলা যায়, সবই তারা স্বীকার করে—এবং মৃত্যু যখন বহু দূরে, তখন সবাই রাজার জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়; কিন্তু বিপদের দিনে, যখন রাষ্ট্রের দরকার হয়ে পড়ে লোকের, তখন কাউকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আর এক কথা, এ বিষয়ের সত্যতা প্রমাণের জন্যে একবারের বেশী দুবার পরীক্ষা করা চলে না—কাজেই এ বিষয়ে পরীক্ষা করতে যাওয়াও বিপজ্জনক। অতএব বুদ্ধিমান রাজার এমন ভাবে চলা উচিত যে, যে কোনো অবস্থাতেই নাগরিকগণ যেন রাষ্ট্র ও রাজার আবশ্যকতা অনুভব করে—তাকে না হলে যে তাদের চলে না, একথা যেন কখনো না ভোলে। তবেই তারা সব সময়ে বিশ্বাস রক্ষা করে চলবে।

দশম পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্রের শক্তি পরিমাপ করার মানদণ্ড

এই সব রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিচার করতে গিয়ে আর এক কথা ভেবে দেখা দরকার। তা হচ্ছে, রাজার এমন শক্তি আছে কি না, যাতে তিনি দরকারের সময়ে নিজের সঙ্গতির উপরে নির্ভর করেই আত্মরক্ষা করতে পারেন, কিম্বা কোনো অবস্থাতেই তার অন্যের সাহায্য না হলে চলে না। এ সম্বন্ধে আমার মত আমি পরিষ্কার ভাবেই বলছি। আমি মনে করি, তারাই নিজেদের সম্বলে নিজেদের রক্ষা করতে পারে, যারা লোক বা অর্থের প্রাচুর্য্য হেতু এমন একদল সৈন্য গড়ে তুলতে পারে, যার সাহায্যে তারা আক্রমণকারী শত্রুর সঙ্গে সমান ভাবে যুদ্ধ চালাতে সমর্থ। আর যাদের পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখীন হওয়া সম্ভব নয় বলে, প্রাকার-পরিখার পিছনে আত্মরক্ষা করা অনিবার্য্য হয়ে পড়ে, তারা কখনই অন্যের সাহায্য ব্যতীত নিজের শক্তিতে দাঁড়াতে পারে না। প্রথমোক্ত বিষয়ের আলোচনা পূর্ব্বেই করা হয়েছে এবং পরেও কথা উঠলে, আবার বলা যাবে এ সম্বন্ধে। শেষোক্ত বিষয়ে এই মাত্র বলা যায় যে তেমন রাজার পক্ষে তার রাজ্যের সহরগুলিকে সুরক্ষিত করে রাখা ও সে সব স্থানে যথোচিত রসদ সংগ্রহ করে রাখা উচিত এবং কখনই তার দেশ রক্ষার চেষ্টা করতে গিয়ে শক্তিক্ষয় করা ঠিক নয়। যে নিজের সহর

সুরক্ষিত করে রাখে এবং প্রজাদের যাবতীয় স্বার্থ ও প্রয়োজন সম্বন্ধে পূর্ব্বোল্লিখিত মত ব্যবস্থা করে, তাকে সহজে কেউ আক্রমণ করতে সাহস পাবে না। কারণ মানুষ সহজে সে সব কাজে হাত দিতে চায় না, যে কাজে অসংখ্য বাধা ও অসুবিধার সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ দেখা যায়; এবং আমাদের আলোচনা থেকেও সহজেই বোঝা যাবে যে নিজের সহর যে সুরক্ষিত করে রেখেছে ও প্রজাদের ঘৃণার পাত্র হয়ে না পড়েছে, তাকে আক্রমণ করতে যাওয়া কারো পক্ষেই বড় সহজ কথা নয়।

জার্ম্মানীর নগরগুলি সম্পূর্ণ স্বাধীন। নগরের বাইরে তাদের অধিকার বড় বেশী দূর বিস্তৃত নয়। তারা ততক্ষণ সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করে যতক্ষণ তা তাদের স্বার্থের অনুকূল বলে মনে করে। তাদের আশে পাশে যে কোনো শক্তিই রাজত্ব করুক না, তারা কারো ভয়েই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে না। যেহেতু সে নগরগুলি এমন সুদৃঢ় ভাবে সুরক্ষিত যে সবাই মনে করে সেগুলিকে জোর করে দখল করা অত্যন্ত শক্ত ও সময়সাপেক্ষ। তাদের যথোপযুক্ত প্রাকার-পরিখা ও প্রচুর কামানের ব্যবস্থা আছে—তাদের সাধারণ ভাণ্ডারে এক বছরের পক্ষে পর্য্যাপ্ত খাবার, পানীয় ও গুলি-গোলা মজুদ থাকে সদা-সর্ব্বদা। তা'ছাড়া, এই পৌর-রাষ্ট্রগুলি সাধারণ লোকদের সর্ব্বদা কাজ দিয়ে ব্যাপৃত রাখে, যাতে তারা শান্ত, শিষ্ট ও রাষ্ট্রের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকে। যে কাজের ব্যবস্থা করা হয়, তা-ও আবার এমন সব কাজ, যাতে নগরের শক্তি বাড়ে ও জীবন রক্ষার সুবিধা হয়। আর সামরিক শিক্ষা ও কুচকাওয়াজকেও তারা উচ্চ আসন দেয় এবং তা বলবৎ রাখার পক্ষে উপযুক্ত আইন-কানুনও তারা করে রেখেছে।

অতএব যে রাজার নগরী দৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত ও যার প্রজারা তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে না, তাকে কেউ আক্রমণ করতে আসবে না। যদি

আসেও কেউ, তবে তাকে যুদ্ধে হেরে পালিয়ে যেতে হবে সম্মান খুইয়ে। কারণ এ সংসার এতই পরিবর্ত্তনশীল যে একদল সৈন্যকে পূরো বার মাস ধরে নির্ব্বিঘ্নে যুদ্ধক্ষেত্রে রাখতে পারা কারো পক্ষেই সম্ভবপর হতে পারে না। এ কথার উপরে কেউ হয়তো বলতে পারেন যে নগরের লোকদের সম্পত্তি যদি নগরের বাইরে থাকে, এবং তারা যদি দেখে যে শত্রুরা তাদের সম্পত্তি পুড়িয়ে ফেলছে, তবে তারা কখনই ধৈর্য্য রক্ষা করতে পারবে না। সুদীর্ঘ অবরোধের দুঃখ ও আত্ম-স্বার্থ তাদের মন থেকে রাজভক্তি দূর করে দেবে। উত্তরে আমি বলবো—যে রাজার যথেষ্ট শক্তি, সামর্থ্য ও সাহস আছে, উপযুক্ত চেষ্টা থাকলে তিনি যে কোনো বাধা-বিপত্তিই কাটিয়ে উঠতে পারবেন। তাঁকে কখনো প্রজাদের মনে আশা জাগিয়ে তুলতে হবে এই বলে যে এ বিপদ বেশীদিন আর স্থায়ী হবে না, কখনো তাদের ভয় দেখাতে হবে, শত্রুর অমানুষিক অত্যাচারের সম্ভাবনার কথা বলে। আর প্রজাদের মধ্যে যাদের সব চেয়ে বেশী সাহসী ও অগ্রসর বলে মনে হবে তাদের সম্বন্ধে কৌশলে যথাবিহিত ব্যবস্থা করে (আবশ্যক হ'লে চরম ব্যবস্থা করে) আত্মরক্ষার উপায় করা আবশ্যক।

তারপরে শত্রু এসে তো প্রথমেই নগরের বাইরে যা কিছু আছে, সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নষ্ট করে দেবে। তখনো লোকের ধমনীতে উষ্ণ রক্ত বইতে থাকে বলে তারা আত্মরক্ষা ও দেশ রক্ষার জন্য আরো বদ্ধপরিকর হয়ে উঠবে, তাই সেক্ষেত্রে সে রাজার ইতস্ততঃ করার আর কিছুই নেই। যেহেতু কিছু পরে যখন শরীরের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসবে —উৎসাহ মন্দীভূত হবে, তখন দেখবে ক্ষতি যা হবার, তা তো হয়েই গেছে, প্রতিকারের কোনো উপায়ই আর নেই। ফলে তারা আরো বেশী উৎসুক হয়ে উঠবে রাজার সঙ্গে মিলে দেশরক্ষার ব্যবস্থা করতে।

কারণ তখন তারা দেখবে যে রাজার সঙ্গে থাকাই তাদের স্বার্থ—রাজার সাহায্য করতে যাওয়ার ফলে যখন তারা তাদের সর্ব্বস্ব হারিয়েছে, তখন তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা যে রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। মানুষের প্রকৃতিই এই যে, তারা যাকে কিছু দেয়, কিম্বা যার কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করে, তার সঙ্গে একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে যায়। অতএব সব দিকে বিবেচনা করে দেখে এ কথা সহজেই বলা চলে যে, কোন বুদ্ধিমান রাজার পক্ষে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত প্রজাদের উৎসাহ উদ্যম রক্ষা করা কিছুমাত্র শক্ত কথা নয়। বিশেষতঃ যতদিন রাজা প্রজার দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতিবিধানে পেছপাও হবে না, ততদিন কোন চিন্তার কারণই নেই।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ধর্ম্ম-যাজকীয় রাজতন্ত্র

এখন শুধু বাকী রয়েছে ধর্ম্ম-যাজকীয় রাজতন্ত্র সম্বন্ধে কিছু বলা। এ সম্বন্ধে যা কিছু অসুবিধা, সব রাজত্বলাভ করার পূর্ব্বে—পরে আর কোনো অসুবিধা নেই। কারণ এরূপ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে ক্ষমতা থাকা দরকার, কিম্বা শুভাদৃষ্ট। কিন্তু পরে সে রাজত্ব বজায় রাখতে আর কোনো গুণেরই দরকার হয় না। প্রাচীন ধর্ম্মানুশাসনের জোরেই এরূপ রাষ্ট্র বেঁচে থাকে। ধর্ম্মের নামে যেসব অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তার শক্তি এত বেশী ও তার প্রকৃতিই এমন যে রাষ্ট্রের যিনি অধিনায়ক তিনি নিজের জীবনে কিভাবে চলেন, কিম্বা অন্যের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন তার উপরে রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নির্ভর করে না—অনুশাসনগুলির জোরেই তা চলতে থাকে। কেবল মাত্র এরূপ রাষ্ট্র-নায়কেরাই রাষ্ট্র থাকা সত্ত্বেও, তা রক্ষার ব্যবস্থা করেন না—প্রজা থাকা সত্ত্বেও, তাদের শাসন করেন না। অরক্ষিত থাকা সত্ত্বেও—তাদের রাষ্ট্র কেউ কেড়ে নেয় না, তাদের প্রজারা দেশ সুশাসিত না হলেও গ্রাহ্য করে না—রাষ্ট্র-নায়কের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার তাদের শক্তিও নেই—ইচ্ছাও নেই। এরূপ রাষ্ট্রই শুধু সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সুখী হতে পারে। কিন্তু এরূপ রাষ্ট্র এমন শক্তির দ্বারা রক্ষিত, যার নাগাল মানুষের মন পেতে

পারে না। তাই এ সম্বন্ধে আমি বেশী কিছু বলতে চাইনে। কারণ ভগবানের ইচ্ছায় যার স্থিতি ও বৃদ্ধি, সে সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া মানুষের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র।

তথাপি কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারেন যে ইতালীতে চার্চ্চের (পোপের) বৈষয়িক শক্তি এতটা বেড়ে গেল কি করে? আলেকজেণ্ডারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেখা যায় যে ইতালীর ছোট বড় রাজন্যবর্গ সকলেই পোপের বৈষয়িক শক্তিকে নিতান্ত নগণ্য বলেই মনে করতো। অথচ এখন ফরাসী-রাজ পর্য্যন্ত তাঁর প্রতাপে কম্পমান—এমন কি তাঁকে ইতালী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া এবং ভেনেসীয় শক্তি ধ্বংস করাও তার পক্ষে সম্ভবপর হয়েছে। যদিও এর কারণ বোঝা কিছুই শক্ত নয়, তবু এ সম্বন্ধে খানিকটা আলোচনা ভাল।

ফরাসী-রাজ চার্লস্ (Charles) ইতালীতে আসার পূর্ব্বে এ দেশের বিভিন্ন অংশ পোপ, ভেনেসিয়ানগণ, নেপেল্স্-রাজ, মিলানের ডিউক ও ফ্লোরেন্টাইন্দের অধীন ছিল। এ সব রাষ্ট্রশক্তিগুলির দুইটি চিন্তা ছিল প্রধান। তার মধ্যে একটা হচ্ছে, কোন বিদেশী শক্তিকে সৈন্য সামন্ত নিয়ে ইতালীতে ঢুকতে দেওয়া হবে না। দ্বিতীয়তঃ—তাদের নিজেদের মধ্যে কেউ আর আপন আপন অধিকারের সীমানা বাড়াতে পারবে না। কিন্তু পোপ এবং ভেনেসিয়ানরা যে কখন কি করে বসে—এই দুর্ভাবনা ছিল আর সকলেরই খুব বেশী। ভেনেসিয়ানদের সংযত রাখতে হলে, অপর সকলের এক জোট হওয়া দরকার—যেমন ফেরারাকে রক্ষা করতে আর পোপকে সংযত রাখতে তারা নিয়োগ করেছিল রোমের অভিজাত-সম্প্রদায়কে। রোমের অভিজাত-সম্প্রদায় ছিল দুই দলে বিভক্ত। এক দলের নাম অরসিনি আর একদলের নাম কলোন্নেসী। এরা সব সময়েই দেশে একটা না একটা

গণ্ডগোল জাগিয়ে রাখতো। উভয় দল ছিল সশস্ত্র এবং পোপকে অগ্রাহ্য করে তার চোখের উপরেই যা খুসী করে বেড়াতো। ফলে পোপকে সব সময়েই দুর্ব্বল ও শক্তিহীন হয়ে থাকতেন। সেক্‌ষ্টাসের (Sextus) মত কোনো কোনো পোপ খুব সাহস দেখিয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁদের ঐশ্বর্য্য বুদ্ধিমত্তা কিছুই তাঁদের এই বিরক্তিকর ব্যাপারের হাত থেকে অব্যাহতি দিতে পারে নি। সাধারণতঃ পোপদের রাজত্বকাল গড়পরতা দশ বছরের বেশী হোতো না; তার মধ্যেই তাঁরা মারা যেতেন—এ-ও ছিল তাঁদের দুর্ব্বলতার আর এক কারণ। এই অল্প সময়ের মধ্যে এক এক জন বড় জোর একটা দলকে আয়ত্তের ভিতর আনতে পারতেন। কিন্তু তার পরেই যিনি পোপের আসনে বসলেন তিনি হয়তো এসেই কাজের ধারা বদলে দিলেন; যেমন, মনে কর, কোনো পোপ কলোন্নাদের প্রায় নির্ম্মূল করে এনেছেন, এমন সময়ে তিনি মারা গেলেন। তার পরে যিনি এলেন তিনি হয়তো এই কলোন্নাদেরই সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিয়ে প্রবল করে তুললেন এবং অরসিনিদের বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে লাগলেন। কিন্তু তাঁর অল্পদিনের রাজত্বকালের মধ্যে অরসিনিদের শক্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠতে পারে না। এই কারণেই পোপের বৈষয়িক শক্তিকে কেউ কোনো দিন বড় গ্রাহ্য করেনি।

পোপদের মধ্যে একমাত্র ষষ্ঠ আলেকজেণ্ডার দেখিয়েছেন যে অর্থ ও বাহুবলে কেমন করে পোপ প্রভূত প্রভাব বিস্তার করতে পারেন অন্য সকলের উপরে। ডিউক ভালেণ্টিনোকে যন্ত্রী করে ও ফরাসীরাজের অভিযানকে উপলক্ষ্য করে আমি যা কিছু পূর্ব্বে বলেছি সবই তিনি করতে পেরেছিলেন। ডিউকের কার্য্যকলাপ আলোচনা উপলক্ষে এ সব কথা আমি পূর্ব্বেই বলেছি। যদিও চার্চ্চের প্রভাব

বৃদ্ধি করা তার উদ্দেশ্য ছিল না—ডিউককে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর সকল চেষ্টার মূল লক্ষ্য, তথাপি তিনি যা করেছেন, তাতে যে চার্চ্চেরই শক্তি বেড়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তার পরে তাঁর মৃত্যু হলে ও ডিউকের শক্তি ধ্বংস হলে তার সমস্ত পরিশ্রমের ফল চার্চ্চেরই প্রাপ্য হল।

আলেকজেণ্ডারের পরে পোপ জুলিয়াস যখন চার্চ্চের শাসনকর্ত্তৃত্ব হাতে পেলেন তখন চার্চ্চ যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে দাঁড়িয়েছে। রোমাগ্‌না তাঁর অধিকারে এসেছে—রোমের অভিজাত সম্প্রদায় হৃতশক্তি ও হতমান হয়ে পড়েছে; যে দলগুলি পরস্পর মারামারি করে দেশের ভিতরে সর্ব্বদা অশান্তির আগুন জ্বেলে রাখতো, আলেকজেণ্ডার তাদের এমন শিক্ষা দিয়েছিলেন যে তাদের আর নামগন্ধ কোথাও ছিল না। তা ছাড়া আলেকজেণ্ডার অর্থ সংগ্রহের এমন সব উপায় বের করেছিলেন, যা তাঁর পূর্ব্বে কেউ কখনো পারেনি। এ সব বিষয়ে জুলিয়াস আলেকজেণ্ডারের প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করেছিলেন। শুধু তা-ই নয়—তিনি তার থেকেও উপরে গিয়েছিলেন। তিনি চাইলেন বোলোণাকে নিজের আয়ত্তে আনতে—ভেনেসীয়দের শক্তি ধ্বংস করতে ও ফরাসী শক্তিকে ইতালী থেকে তাড়িয়ে দিতে। এই সব কয়টিতেই তিনি যথেষ্ট কৃতকার্য্য হয়েছিলেন; বিশেষ করে তাঁকে বাহাদুরি দিতে হয় এই জন্য যে তিনি যা করেছেন, তা কোনো ব্যক্তিবিশেষের পেট ভরাবার জন্যে নয়—সবই চার্চ্চের প্রভুত্ব ও প্রভাব বাড়াবার জন্যে। অরসিনি ও কলোন্না দলের শক্তি বাড়াতে না দিয়ে তিনি তাদেরও আয়ত্তের ভিতরে রাখতে পেরেছিলেন। তবু তাদের ভিতরে তখনো গণ্ডগোল করার একটা বিশেষ প্রবণতা ও প্রবৃত্তি ছিল। তা প্রতিবিধানের জন্য জুলিয়াস দুই প্রকার ব্যবস্থা করেছিলেন। এক চার্চ্চের শ্রেষ্ঠত্ব

ও প্রভুত্বকে কোথাও ক্ষুণ্ণ হতে না দেওয়া, যার অপ্রতিহত শক্তির ভয় দেখিয়ে তিনি সকলকে ঠাণ্ডা রাখতেন। দ্বিতীয় হচ্ছে—তাদের দলভুক্ত কোনো লোককে ধর্ম্ম-যাজক হতে না দেওয়া। এইরূপ ধর্ম্মযাজকেরাই গোলমাল সৃষ্টি করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। কোন দলভুক্ত ব্যক্তিবিশেষ ধর্ম্মযাজক নিযুক্ত হোলেই, সে আর বেশী দিন চুপ করে থাকে না। তারাই দলাদলিটা আরো পাকিয়ে তোলে রোম নগরে, কিম্বা রোমের বাইরে যেখানেই সুবিধা জোটে। ক্রমে উভয় পক্ষের ভিতরে তিক্ততা এতটা ঘনিয়ে ওঠে যে তখন আর ব্যারণরা তাদের পক্ষে না দাঁড়িয়ে পারে না। ফলে এই ধর্ম্মযাজকদের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্যে ব্যারণদের ভিতরে ঝগড়া বিবাদ বেঁধে যায়—দেশেও অশান্তির সীমা থাকে না। এই সব কারণেই বর্ত্তমান পোপ মহামহিমান্বিত লিয়োর হাতে চার্চ্চকে যথেষ্ট প্রতাপশালী দেখতে পাই। আর আমরা আশা করি, অন্যান্য পোপরা যদি চার্চ্চের প্রভুত্ব ও শক্তি বাড়িয়ে গিয়ে থাকেন, তিনি চার্চ্চের শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান আরো বাড়াতে পারবেন তার আপন শুভবুদ্ধি ও অন্য অসংখ্য সদ্‌গুণের বলে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সৈন্যদের প্রকার ভেদ ও ভাড়াটে সৈন্য

বিভিন্ন প্রকারের রাষ্ট্রের ভিতরে যেগুলির আলোচনা করবো বলে গোড়াতেই প্রস্তাব করা হয়েছিল, তা শেষ হয়েছে। এই সব রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও বিশেষ লক্ষণ, তার মধ্যে কোনগুলি ভাল, কোনগুলি মন্দ এবং সেরূপ হওয়ার কারণ কি, এবং কি উপায় অবলম্বন করে অনেকেই রাজ্য জয় ও রক্ষার ব্যবস্থা করেছে—এ সব সম্বন্ধে যা বলবার সবই বলেছি। এখন শুধু এই সব রাষ্ট্রের আক্রমণ ও আত্ম-রক্ষার উপায় বা সামরিক শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা বাকী রইল।

আমরা পূর্ব্বেই দেখেছি যে রাজ্যের ভিত্তি খুব শক্ত করে গড়ে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি। যে এ বিষয়ে ভুল করবে, তার ধ্বংস অনিবার্য্য। কিন্তু নূতন হোক, পুরাতন হোক, কিম্বা মিশ্র হোক—সব রাষ্ট্রেরই আসল ভিত্তি হচ্ছে ভাল আইন-কানুন ও উপযুক্ত সামরিক শক্তি। কিন্তু যে রাষ্ট্রের উপযুক্ত সামরিক শক্তি নেই, সেখানে ভাল আইন-কানুন চলতে পারে না। অথচ যেখানে উপযুক্ত সৈন্য-সামন্ত আছে সেখানেই ভাল আইন-কানুন প্রবর্ত্তিত হয়। এখানে আমি আইন-কানুন সম্বন্ধে কিছু বলবো না—শুধু সামরিক শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

সামরিক শক্তি বলতে যা বুঝায়, তার মধ্যে ফৌজই প্রধান। যে ফৌজের সাহায্যে রাজা দেশ রক্ষা করেন, তা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব কিংবা ভাড়াটে মিত্র সৈন্যদ্বারা গঠিত অথবা উভয় ধরণের মিশ্র ফৌজ হতে পারে। বেতনভোগী, ভৃত্য, ভাড়াটে সৈন্য ও মিত্র সৈন্যের উপর নির্ভর করা যেমনি বিপদজনক তেমনি তাদের কাছ থেকে কাজও পাওয়া যায় না ঠিক মত। তাই এরূপ সৈন্যের ভরসায় যিনি রাজ্য রক্ষা করতে চান তার শাসন দৃঢ় ভিত্তির উপরেও দাঁড়াবে না, নিরাপদও হবে না। যেহেতু এরূপ সৈন্যের পরস্পরের ভিতরে একতা থাকে না, শৃঙ্খলাও থাকে না—তারা হয়ে ওঠে ক্ষমতাপ্রিয়, উচ্চাভিলাষী ও অবিশ্বাসী—তাদের যত বীরত্ব সব বন্ধুদের সামনে, শত্রু কাছে এলেই তারা হয় কাপুরুষ। তারা না করে সমীহ ঈশ্বরকে, না রক্ষা করে বিশ্বস্ততা কোনো মানুষের সঙ্গে। কাজেই যিনি এরূপ সৈন্যের উপর নির্ভর করেন, কোনো শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার ধ্বংস অনিবার্য। যুদ্ধের সময় যে লুঠতরাজ শত্রু সৈন্য করে, শান্তির সময় এরা তোমার ওপর তাই করে। এর কারণ হচ্ছে যে তোমার জন্য প্রাণ দেবার মত আকর্ষণ এদের কিছুই নেই; যে বেতন নিয়ে এরা সৈন্যশ্রেণীতে ভর্ত্তি হয় তার পরিমাণ এত সামান্য যে তার জন্য তারা নিজের জীবন বিসর্জ্জন করা মোটেই সঙ্গত বিবেচনা করে না। তারা সৈন্য দলে ভর্ত্তি হতে অতি মাত্র ব্যগ্র যখন যুদ্ধ থাকে দূরে—কিন্তু যখনি যুদ্ধ ঘনিয়ে আসে, তারা হয় সরে পড়ে আগে আগেই, নয় তো শত্রু দেখলেই পালায়। এ বিষয়ের প্রমাণেরও অভাব নেই। ইতালীই এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বহুদিন এই ভাড়াটে সৈন্যের উপর নির্ভর করেই ইতালী সর্ব্বনাশের পথে এগিয়েছে। তার বর্ত্তমান হীন অবস্থার এ ছাড়া আর অন্য কোনো কারণই নেই। কোন কোন সময়

তারা খানিকটা চমক লাগিয়েছে এবং যতদিন এদেশীয় লোকদের সঙ্গে লড়াই করেছে, ততদিন তাদের সাহসী বলেও লোকে মনে করেছে। কিন্তু যখনি বিদেশী শত্রু ঘরের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছে, তখনি তারা তাদের আসল প্রকৃতির পরিচয় দিয়েছে। সে জন্যই ফরাসীরাজ অষ্টম চার্ল্‌স্ অস্ত্রের পরিবর্ত্তে চা-খড়ি হাতে নিয়েই ইতালীতে এসে কোন কোন জায়গা আপন অধিকারে, তা চিহ্নিত করেছিলেন এবং বিনা যুদ্ধেই সে সব জায়গা দখল করেছিলেন। যিনি বলেন, যে আমাদের পাপের ফলেই এরূপ হয়েছে, তাঁর কথা খুবই ঠিক; কিন্তু তিনি যে পাপের কল্পনা করেন, তা নয়—আমি যে পাপের কথা বলছি তাই—অর্থাৎ ভাড়াটে সৈন্য নিযুক্ত করার পাপেই এরূপ হয়েছে। এই পাপ দেশের রাজাদেরই পাপ—তাঁরাই এদের নিযুক্ত করেন—তাই তাঁদেরই প্রধানতঃ ভোগ করতে হয়েছে এ পাপের শাস্তি।

এরূপ সৈন্যের অনুপযোগিতা আরো অনেক দিক থেকে দেখানো যায়। এই ভাড়াটে সৈন্যের সেনাপতিরা হয় এক এক জন খুব দক্ষ যোগ্য ব্যক্তি, অথবা তার উল্টা। যদি দক্ষ হয় তবে তাদের উপরে একান্ত বিশ্বাস স্থাপন করে নিশ্চিন্ত হতে পারো না। কেন না, তোমাকে ছাড়িয়েও বড় হবার জন্যে তারা লালায়িত হয়ে উঠবে এবং তাদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যে, যে তুমি তার প্রভু—তোমার উপরেও অত্যাচার চালাবে, নয়তো অন্যের উপরে চালাবে, যা তুমি মোটেই চাও না। তারা যদি যোগ্য লোক না হয়, তবে তো কথাই নেই—তোমার ধ্বংস অনিবার্য্য—এরূপ ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে সাধারণ নিয়ম অনুসারে।

কেউ বলতে পারেন, সশস্ত্র ব্যক্তি মাত্রেই অমনি ভাবে চলবে,—তা সে ভাড়াটে হোক, কি না হোক। আমার উত্তর হচ্ছে এই যে

যখন অস্ত্র ব্যবহার করবার সময় আসবে অর্থাৎ কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়ে, রাজার উচিত নিজেই সেনাপতি হয় আপন হাতে সৈন্য পরিচালন করা। আর যে রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত তার পক্ষে কর্ত্তব্য নাগরিকগণের ভিতর বেছে কাউকে পাঠানো। যাকে পাঠানো হবে, সে যদি সন্তোষজনকভাবে কাজ না করে, তবে তাকে অবিলম্বে ফিরিয়ে আনা উচিত। আর যদি সে যোগ্য প্রমাণিত হয়, তবে সে যাতে সেই কাজ ছেড়ে চলে না আসে, নূতন আইন পাশ করেও, তার ব্যবস্থা করা উচিত। এরূপ দেখা গিয়েছে যে অনেকে একা একা নিজের পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে উন্নতির সমুচ্চ সোপানে আরোহণ করেছে, কিন্তু যখনি ভাড়াটে সৈন্য নিযুক্ত করেছে, তারা ভাল কিছুই করতে পারে নি—শুধু ক্ষতির কারণই হয়েছে। এ কথা রাজতন্ত্র সম্বন্ধে যেমন সত্য, গণতন্ত্র সম্বন্ধেও তেমনি সত্য। গণতন্ত্র সম্বন্ধে আর এক কথা এই যে কোন গণতন্ত্রের লোকের দ্বারা গঠিত সৈন্যের সাহায্যে কোন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে সেই গণতন্ত্রে নিজের একাধিপত্য স্থাপন করা অত্যন্ত শক্ত। কিন্তু সে যদি সৈন্য বেতনভোগী ভাড়াটে সৈন্য হয়, তবে তা বড় বেশী মুস্কিলের কথা নয়। রোম ও স্পার্টা যুগ যুগ ধরে সশস্ত্র অবস্থায় ছিল এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনও ছিল। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের অধিবাসীবৃন্দ কেউই নিরস্ত্র নয়, অথচ স্বাধীনতাও ভোগ করছে তারা পূরোপূরি।

পূরাকালের উদাহরণ হিসেবে কার্থেজের কথা বলা যেতে পারে। তথাকার অধিবাসীরা প্রথম রোমান যুদ্ধের পরে, তাদের ভাড়াটে বিদেশী সৈন্যদের দ্বারা অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত হয়েছিল; যদিও কার্থেজবাসীরাই সে সব সৈন্যের অধিনায়ক ছিল তবু তারা রক্ষা পায় নি। ইপামিনোণ্ডাসের মৃত্যুর পরে থিবিস-বাসীরা ম্যাসিডনের

ফিলিপকে বাইরে থেকে এনে তাদের সৈন্যের সেনাপতিরূপে বরণ করে নেয়। ফলে শত্রুর সঙ্গে জয়লাভ করার পরে ফিলিপই সে দেশের স্বাধীনতা হরণ করে।

ডিউক ফিলিপের মৃত্যুর পরে মিলানবাসীরা ফ্রান্‌সেস্কো স্ফরজাকে (Francesco Sforza) নিয়োগ করেছিল ভেনেসিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। ফ্রানসেস্‌কো স্ফরজা কারাভানিয়োর যুদ্ধে (১৪৪৮) তাদের হারিয়ে দিল। কিন্তু তারপরেই সে ভেনেসিয়ানদের সঙ্গে জুটে, যে মিলানবাসীরা তাকে নিযুক্ত করেছিল, তাদের ধ্বংসের জন্যই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো। এই স্ফরজার পিতাকেই নেপলসের রাণী জিওভান্না (Queen Giovanna) তাঁর সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। সময় বুঝে সে রাণীকে পরিত্যাগ করায় তাঁকে আত্মরক্ষা করবার জন্য আরাগণ রাজের অধীনতা স্বীকার করতে হয়।

এ কথা সত্য যে ভেনেসিয়ানরা এবং ফ্লোরেন্‌স্‌বাসীরা পূর্ব্বে এরূপ ভাড়াটে সৈন্যের সাহায্যেই অন্য দেশ জয় করে তাদের রাজ্যের সীমানা বাড়িয়েছে—এবং তাদের সেনাপতিরা কেউই দেশের রাজা হয়ে বসেনি, বরং যখনি বিপদ এসে উপস্থিত হয়েছে, তখনি তারা দেশরক্ষার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু আমার মতে ফ্লোরেন্‌স্‌বাসীদের বেলায় দৈবই তাদের রক্ষা করেছে। যে সব যোগ্য সেনাপতিরা দেশে বিপদ ঘটাতে পারতো, তাদের মধ্যে কেউ কেউ যে সব যুদ্ধে তাদের পাঠান হয়েছে, তাতে জয় লাভ করতে পারেনি—কেউ কেউ অপর কোনো সেনানায়কের অবিরত বিরোধিতার ফলে স্থবিধা করে উঠতে পারে নি—কেউ কেউ বা তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের ক্ষেত্র অন্যত্র খুঁজে পেয়েছিল। এদের মধ্যে একজন ছিল গিয়োভানী আকুটো (Giovanni Acuto)। সে ছিল ইংরেজ—আসল নাম

স্যর্ জন হক্‌উড্ (Sir John Hawkwood)। ইঙ্গ-ফরাসীর যুদ্ধে সে নাম করেছিল। সেই যুদ্ধের শেষে একদল সৈন্য নিয়ে সে ইতালীতে আসে ; এরাই "সাদা পল্টন" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সে ফ্লোরেন্‌স্‌এর পক্ষে হয়ে যুদ্ধ করেছে, কিন্তু কখনো নিজে রাজা হয়ে বসবার চেষ্টা করেনি। তার কারণ হচ্ছে যে, তাকে যে যুদ্ধে পাঠানো হয়েছিল, সে যুদ্ধে সে জয় লাভ করতে পারেনি। অন্ততঃ যুদ্ধে জিতে এলে সে যে কি করতো, সে সম্বন্ধে কিছুই প্রমাণিত হয় নাই। একথা সকলকেই স্বীকার করতে হবে, যে সে যদি যুদ্ধে জয়লাভ করে ফিরতো, তবে ফ্লোরেন্‌স্‌এ সে যা খুসী তা-ই করতে পারতো। স্ফরজাতে ও ব্রাসেস্কিতে (Bracceschi) বনিবনা ছিল না—ফলে তারা সদা সর্ব্বদা পরস্পর পরস্পরের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখত। ফ্রান্‌সেস্‌কোর (Francesco) নজর ছিল লম্বার্ডির উপরে—আর ব্রাসিয়ো (Braccio) তার সমস্ত শক্তি নিয়ে লেগে গেল চার্চ্চ ও নেপল্‌স রাজ্যের বিরুদ্ধে।

এসব অনেক দিনের কথা ; অল্প দিন পূর্ব্বে ঘটছে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই, যা আমার কথাকে সমর্থন করে। ফ্লোরেন্‌স্‌বাসীরা পায়োলো ভিটেল্লীকে (Paolo Vitelli) তাদের সেনাপতি পদে বরণ করেছিল। পায়োলো বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। সামান্য অবস্থা থেকে তিনি আপন ক্ষমতা বলে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন। তিনি যদি পিসা অধিকার করতে পারতেন, তবে ফ্লোরেন্‌স্‌বাসীদের পক্ষে যে তাকে আর বিদায় করে দেওয়া সুবিবেচনার কাজ হোতো না, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেন না তিনি যদি তখন তাদের শত্রুপক্ষে যোগ দিতেন, তবে ফ্লোরেন্‌স্‌বাসীদের এমন সাধ্য ছিল না যে তাঁকে ঠেকিয়ে রাখে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে তাকে নিজেদের কাজে

নিযুক্ত রাখলেও, তাঁর আজ্ঞাবহ হয়ে চলা ভিন্ন উপায় ছিল না। ভেনেসিয়ানদের কার্য্য-কলাপ বিবেচনা করে দেখা যায় যে তারা যতদিন তাদের দেশী লোকদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠিয়েছে, ততদিন তারা বেশ নিরাপদে ছিল এবং তাদের গৌরবও বেড়েছে অনেকখানি। যতদিন তাদের ভদ্রসন্তানেরা সেনানায়ক হয়ে দেশের সাধারণ লোকদের নিয়ে নিজেরাই যুদ্ধ পরিচালনা করেছে, ততদিন তারা যথেষ্ট শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় দিয়েছে।

এ হচ্ছে তখনকার কথা যখন তারা জলযুদ্ধ নিয়েই ব্যাপৃত ছিল—স্থল যুদ্ধের হাঙ্গামায় হাত দিতে যায়নি। কিন্তু যখনি তারা জল ছেড়ে স্থলে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করল, তখনই তারা তাদের সে চমৎকার প্রথা ছেড়ে দিয়ে, ইতালীর চিরচরিত কুপ্রথা অবলম্বন করলো। তারা যখন এদেশে তাদের রাজ্য বৃদ্ধি করতে স্থরু করে দিল, প্রথম প্রথম তাদের বিশেষ কিছু আশঙ্কার হেতু ছিল না তাদের সেনাপতিদের দিক থেকে। তার এক কারণ, তখন তাদের রাজ্যে যা ছিল, তা নাম মাত্র। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, তখনো তাদের প্রতিপত্তি এত বেশী ছিল যে কেউ-ই তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস করতো না। কিন্তু পরে যখন তাদের রাজ্যবৃদ্ধি হতে লাগলো—যেমন হয়েছিল কার্‌মাগনোলার (Carmagnola) অধিনায়কতায়—তখনই তাদের এই ভুলের যে অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফল, তার স্বাদ তারা পেয়েছিল। কার্‌মাগনোলা অসম-সাহসিক যোদ্ধা ছিল। তার অধিনায়কতায় ভৈনেসিয়ানরা মিলানের ডিউককে যুদ্ধে পরাজিত করেছিল। কিন্তু পরে তারা দেখলো যে কার্‌মাগনোলা তেমন গা লাগিয়ে যুদ্ধ করে না—যেন কতকটা উদাসীন ; তাই তারা বুঝলো যে তার অধিনায়কতায় আর তাদের কোন ফয়দা হবেনা—যুদ্ধে গেলে হেরেই আসবে। অথচ সে অবস্থায়

তারা না পারলে তাকে ছাড়াতে, না চাইলো তারা তাকে ছেড়ে দিতে। এই উভয় সঙ্কটের মাঝে পড়ে অবশেষে তাকে হঠাৎ খুন করে তাদের আত্ম-রক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। পরে তারা বারতোলোমিও-দা-বেরগামো (Bartolommeo da Bergamo), রবার্তো-দা-সান-সেভেরিনো (Roberto da San Severino) পিটিগ্‌লিয়ানোর কাউন্ট (Count di Pitigliano) প্রভৃতিকে বাইরে থেকে এনে তাদের সৈন্য-বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেছিল। কিন্তু এদের অধিনায়কতায় নূতন লাভের আশা ছেড়ে দিয়ে, যা আছে তা-ও না যায়—এই আশঙ্কায় তাদের উদ্বিগ্ন থাকতে হোতো। এমন ব্যাপারই হয়েছিল পরে ভাইলার (Vaila) যুদ্ধে। আটশ' বছরের পরিশ্রমে তারা যা লাভ করেছিল, এই এক যুদ্ধেই তারা সব খুইয়েছিল। ভাড়াটে যোদ্ধার সাহায্যে জয়লাভ বহু সময়সাপেক্ষ এবং যা লাভ হয়, তা-ও যৎসামান্য, কিন্তু ক্ষতি যখন আসে, তা যেমন ব্যাপকতায় অপরিসীম, তেমনি হঠাৎ এসে ঘাড়ে চেপে বসে তার সমগ্র ভীষণতা নিয়ে।

আলোচ্য বিষয়ের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে আমি যখন ইতালীর বর্ত্তমান ইতিহাসের ভিতরে এসে ঢুকেছি, তখন ইতালী সম্বন্ধেই আর একটু বিস্তৃততর আলোচনা করা যাক। ইতালী বহুদিন ধরে ভাড়াটে সৈন্য দ্বারা শাসিত হয়েছে। কেন এবং কি করে এই প্রথা এখানে সুরু হয়েছে এবং তার পরিণতিই বা কি হয়েছে, তা ভাল করে জানা না থাকলে এই কুপ্রথার উচ্ছেদও সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। প্রথম কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এতদিন যে জার্ম্মাণ সম্রাটকে সমস্ত খৃষ্টান জগতের সম্রাট বলে সবাই মানতো, সম্প্রতি ইতালীতে তার সে কর্ত্তৃত্বের অবসান হয়েছে—কেউ আর তাকে সে সম্মান দিতে রাজী নয়। দ্বিতীয় কথা, চার্চ্চের জাগতিক সম্পত্তি ও প্রভাব

প্রতিপত্তি—তার রাজ্যের সীমানা অনেকখানি বেড়েছে। তৃতীয়তঃ ইতালীর বড় বড় নগরের অনেকগুলিই অভিজাত সম্প্রদায়ের অধীনতা পাশ ছিন্ন করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন গণতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। এইসব অভিজাতেরা সম্রাটের পরিপোষকতায় তাদের অধীন নগরগুলির উপর অবাধ অত্যাচার চালাতো। তার ফলেই এরূপ হয়েছে। কোন কোন নগরে আবার সেখানকার কোনো প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিবিশেষ পোপের উৎসাহে ও সহায়তায় নিজেই রাজা হয়ে বসেছে। পোপ চেয়েছেন নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াতে। কিন্তু তার ফলে কোনো কোনো ব্যক্তিবিশেষের এরূপ সুবিধা হয়ে গেছে। ফলে অবস্থা দাঁড়ালো এই যে ইতালীর কতক অংশ চার্চ্চের হাতে এসে গেলো এবং বাকী অংশে কতকগুলি গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হোলো। কিন্তু চার্চ্চ হল এক পুরোহিত-সংঘ এবং গণতন্ত্র হল জনসাধারণের গড্ডলিকা—যুদ্ধের এরা কি বোঝে?—অস্ত্রধারণে এরা উভয়েই অক্ষম। ফলে এই উভয়ের তরফ থেকেই ইতালীতে বিদেশী সৈন্য আমদানী সুরু হয়ে গেল।

রোমাগ্‌নাবাসী আলবেরিগো-দা-কোমোর (Alberigo-Da-Como) কীর্ত্তিকলাপের ফলেই সর্ব্বপ্রথম এরূপ সৈন্যের প্রতিষ্ঠা ছড়িয়ে পড়ে। তার শিষ্যদের মধ্যে যারা নাম করেছিল, তাদের মধ্যে ব্রাসিয়ে এবং স্ফরজাও ছিল অন্যতম। এরা দুজনেই এক এক সময়ে ইতালীর ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এদের পরে যারা এসেছে তারাই এখনও ইতালীর সৈন্যসামন্ত পরিচালনা করছে। কিন্তু তাদের সমস্ত সাহস বীর্য্যের ফল হয়েছে এই যে ইতালী বার বার সম্রাট চার্লসের দ্বারা পদ-দলিত, ফরাসী রাজ লুই দ্বারা লুণ্ঠিত, স্পেন-রাজ ফারডিনাণ্ড দ্বারা বিধ্বস্ত এবং সুইস্‌দের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছে। যুদ্ধের সময়ে তারা যে নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়েছে, তা হচ্ছে প্রথমত পদাতিক সৈন্যের

হীনতা ও অকর্ম্মণ্যতা প্রতিপন্ন করা, যাতে সেনাপতিদের নিজেদের কৃতিত্ব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। তাদের নির্ভর করতে হোতো নির্দ্দিষ্ট বেতনের উপর—সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ছাড়া কোনো সম্পত্তির আয় নির্দ্দিষ্ট ছিল না। ফলে সৈন্যসংখ্যা বেশী বাড়ানো তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অথচ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকার ভিতরে যে স্বল্প সংখ্যক পদাতিক সৈন্য রাখা যেতে পারতো, তার দ্বারা দেশে কোনো প্রতিপত্তিই হয় না। কাজে কাজেই তারা পদাতিক সৈন্য কমিয়ে দিয়ে অশ্বারোহী সৈন্যের উপরে বেশী জোর দিতে লাগল। অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক অশ্বারোহী নিয়েই তারা যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও সম্মানের অধিকারী হোতে পারতো। অবস্থা এমনি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে বিশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনীতে দু হাজার পদাতিকও থাকে না। তা ছাড়া, তাদের নিজেদেরও অধীন সৈন্যদের পরিশ্রম ও বিপদের সম্ভাবনা এড়াতে যত রকমের কৌশল সম্ভব, তা তারা অবলম্বন করেছে। বিপক্ষের সৈন্য ধ্বংস না করে, তারা চেষ্টা করতো তাঁদের বন্দী করতে এবং তার পরে কোন রকমের বিনিময় মূল্য না নিয়েই দিত অমনি ছেড়ে। তারা রাতের বেলা না যেত কোন সহর আক্রমণ করতে, না বেরোতো কোন সহর থেকে অবরোধ-কারী শত্রু সৈন্যকে যুদ্ধ দিতে। সৈন্যাবাসের চারদিকে তারা প্রাকার পরিখা নির্ম্মানের আবশ্যকতা অনুভব করতো না এবং শীতের দিনে যুদ্ধ-বিগ্রহ সর্ব্বদা পরিহার করে চলতো। এই সবই ছিল তাদের সামরিক আইনে অনুমোদিত, যে আইন তারা নিজেরাই সৃষ্টি করেছে পরিশ্রম ও বিপদ এড়াবার জন্যে। ফলে এদের নিযুক্ত করে ইতালীর লাভের মধ্যে সার হয়েছে দাসত্ব ও সমগ্র জগতের ঘৃণা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মিত্র সৈন্য, মিশ্র সৈন্য ও নিজস্ব সৈন্য

আর এক রকমের কুপ্রথা হচ্ছে মিত্র সৈন্য নিযুক্ত করা। কোনো রাজা বিপদে পড়ে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হয়ে অন্য কোনো রাজার সাহায্য প্রার্থনা করে। সে রাজা তখন আপন সৈন্য নিয়ে এসে লড়াই করে তার পক্ষ হয়ে। এই প্রকারের সৈন্যকে বলে মিত্র সৈন্য। অল্পদিন পূর্ব্বেও পোপ এই পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। ফেরারার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে তিনি প্রথম ঠেকে শিখলেন যে ভাড়াটে সৈন্য কোনো কাজের না। তখন তিনি মিত্র-সৈন্যের সাহায্য নিলেন এবং স্পেন-রাজ ফারডিনাণ্ডের সঙ্গে ব্যবস্থা করলেন যাতে ফারডিনাণ্ড তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এসে তার হয়ে ফেরারার সঙ্গে যুদ্ধ করে। এরূপ সৈন্য সৈন্য-হিসেবে খুবই ভাল এবং কার্য্যক্ষম হতে পারে, কিন্তু যে তাদের ডেকে আনে, তার পক্ষে শুভদায়ক হয় না। কারণ এরূপ সৈন্য পরাজিত হলেও তার সর্ব্বনাশ—যদি জয়লাভ করে, তাহলেও তাকে তাদের হাতের পুতুল হয়ে থাকতে হয়।

প্রাচীন ইতিহাসে এর দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কিন্তু তার ভিতরে আমি ঢুকতে চাই নে। পোপ জুলিয়াসের দৃষ্টান্ত অল্প দিনের কথা বলে, তা থেকে লোকে যতটা সহজে এরূপ সৈন্য নিয়োগের বিপদ বুঝবে

প্রাচীন দৃষ্টান্তে তা হবে না। তাই তার কথাই আলোচনা করতে চাই। তিনি ফেরারা জয় করতে উঠে পড়ে লাগলেন, কিন্তু তা করতে গিয়ে তিনি বিদেশীর সাহায্য নিয়ে সম্পূর্ণরূপে তাদের হাতের মধ্যে যেয়ে পড়েন। কিন্তু অদৃষ্ট ভাল ছিল—তাই এক অভাবনীয় যোগাযোগের ফলে তিনি তাঁর হঠকারিতার অনিবার্য্য প্রতিফলস্বরূপ বিশেষ কোনো দুর্ভোগ না ভুগেই রেহাই পেলেন। তিনি স্পেন থেকে যে মিত্র সৈন্য ডেকে আনলেন তারা রাভেনাতে (Ravenna) পরাজিত হয়ে হটে এলো। তখন নিতান্ত অভাবনীয় রূপে হঠাৎ সুইসরা এসে বিজয়ী শত্রুপক্ষকে তাড়িয়ে দিল। এমন ব্যাপার যে হোতে পারে, তা পোপ নিজেও ভাবেননি—অন্য কেউও মনে করতে পারেনি। তাই নিতান্ত অদৃষ্টগুণেই তিনি এ যাত্রা রক্ষা পেলেন শত্রুর হাতে বন্দী হওয়ায় হীনতা থেকে। তারপরে শত্রু-সৈন্য বিতাড়িত হওয়ার পরেও যে মিত্র-সৈন্যের হাতে তার লাঞ্ছনা পেতে হয় নি, তার কারণ হচ্ছে মিত্র-সৈন্য তাকে রক্ষা করতে পারে নি—সুইসরা আসার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তারা হেরে হটেই এসেছিল।

ফ্লোরেন্সের নিজের সৈন্য ছিল না। দশ হাজার ফরাসী সৈন্য ধার করে এনে তারা পিসা (Pisa) জয় করতে গেল। তার ফলে তারা এমন গুরুতর বিপদের সম্ভাবনার ভিতরে গিয়ে পড়েছিল যে তেমন বিপদ তাদের আর কখনো হয়নি।

কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলেএর সম্রাট জোয়ানিজ কান্তাকুজেনাস (Joannes Cantacuzenus 1300-1383) দশ হাজার তুর্ক সৈন্য ডেকে এনে তার প্রতিবেশী গ্রীকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়েছিলেন; কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে তুর্ক-সৈন্য আর গ্রীস ছেড়ে যেতে রাজি হল না। এইরূপে গ্রীসে বিধর্ম্মীদের কর্ত্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা ও গ্রীসের পরাধীনতার গোড়াপত্তন হয়।

অতএব জয়ের আকাঙ্ক্ষা যার নেই, তার পক্ষেই এরূপ সৈন্য নিযুক্ত করা শোভন—অন্যের পক্ষে নয়। ভাড়াটে সৈন্যের চাইতেও মিত্র-সৈন্যের সাহায্য নেওয়া বিপজ্জনক। মিত্র সৈন্যের উপর নির্ভর করে যুদ্ধে নামা আর সাধ করে বিপদকে ডেকে আনা একই কথা। তারা সবাই থাকে এক জোট হয়ে এবং চলে অপরের হুকুম মেনে, কিন্তু ভাড়াটে সৈন্যের বেলায় একথা খাটে না। তারা যুদ্ধে জয়লাভ করে ফিরলেও, হঠাৎ তোমার কোনো অনিষ্ট করতে পারে না—সেজন্যে তাদের উপযুক্ত সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করতে হয়। সাধারণত তারা সবাই এক সম্প্রদায়ের লোক হয় না—তুমিই তাদের নিযুক্ত কর এবং তুমিই তাদের বেতন দাও। ফলে যাকে তুমি তাদের সেনাপতি পদে নিযুক্ত কর, তার পক্ষে সহসা এতটা কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বের অধিকারী হওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে না, যাতে সে ইচ্ছামত যখন তখন ক্ষতি করতে পারে। মোট কথা—ভাড়াটে সৈন্যের ভীরুতা সর্ব্বনাশকর, কিন্তু মিত্র সৈন্যের সাহস-বীর্য্যই অধিকতর বিপজ্জনক, যে তাদের ডেকে আনে, তার পক্ষে। অতএব যে কোন সুবিবেচক রাজার এরূপ সৈন্য নিযুক্ত করার কথা চিন্তা করাও অন্যায়—নিজের লোকজনের উপর নির্ভর করেই যা কিছু ব্যবস্থা করবার করা উচিত। এমন কি নিজের উপর নির্ভর করে আবশ্যক হলে সে পরাজয় মাথা পেতে নিতেও রাজি, তবু সেরূপ সৈন্যের সাহায্যে জয়লাভ করতে চায় না। কেননা, পরের সাহায্যে যে জয় তাকে সত্যিকারের জয় বলা চলে না।

এ বিষয়েও আমি সিজার বর্জিয়ার দৃষ্টান্তই সকলের সামনে উপস্থিত করছি দ্বিধাহীন চিত্তে। তিনি ফরাসী দেশ থেকে মিত্র-সৈন্য নিয়ে এসে রোমাগ্নাতে গিয়েছিলেন। তাদের সাহায্যে এবং একমাত্র তাদের উপর নির্ভর করেই তিনি ইমোলা (Imola) এবং ফোরলি (Forli)

অধিকার করেন। কিন্তু এর পরেই তিনি বুঝলেন যে এরূপ সৈন্যের বিশ্বস্ততার উপরে ভরসা করা যায় না; এর চেয়ে অন্ততঃ ভাড়াটে সৈন্য থেকে বিপদের সম্ভাবনা কম মনে করে, তিনি অবিলম্বে ভাড়াটে সংগ্রহে মন দিলেন এবং ওরসিনি (Orsini) ও ভিটেলি (Vitelli)কে ডেকে এনে নিজের কাজে ভর্ত্তি করে নিলেন। এদের সঙ্গে কারবার করেও যখন তিনি দেখলেন যে এদের উপরেও ভরসা করা যায় না—এদের সহায়তাও বিপজ্জনক ও এদের কাজকর্ম্ম, চলা-ফেরা সন্দেহজনক, তখন এদেরও ধ্বংস করে নিজের লোকজনের উপরে নির্ভর করার ব্যবস্থা করলেন। এরূপ বার বার ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের যে কি ফল হয়েছিল, তা বুঝতে হলে আমাদের ভেবে দেখতে হয় যে বিভিন্ন সময়ে দেশে তার প্রভাব প্রতিপত্তি কি ছিল—এই পরিবর্ত্তনের ফলে তা বেড়েছিল, কি কমেছিল। এখন প্রশ্ন এই যে বার বার এরূপ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ডিউকের পক্ষে ঠিক হয়েছিল কি না? অর্থাৎ কোন্ ব্যবস্থা তার পক্ষে ভাল ছিল—ফরাসী সৈন্যের উপরেই নির্ভর করা, না ওরসিনি ও ভিটেলির উপরেই ভরসা করে থাকা? কিম্বা শেষ কালে তিনি যে নিজেই সৈন্য সংগ্রহ করে নিজের সামরিক শক্তি গড়ে তুলেছিলেন, তা-ই তার পক্ষে ঠিক হয়েছিল? তিনি নিজের সৈন্য নিজে সংগ্রহ করে বুঝেছিলেন যে একমাত্র এরূপ সৈন্যের বিশ্বস্ততার উপরেই নির্ভর করা চলে এবং ঠিকভাবে গড়ে তুললে এরা ক্রমে আরো বিশ্বাসী হয়ে উঠে, এবং লোকেও যখন দেখলো যে তিনি নিজেই তার সৈন্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা—অন্য কারো উপরেই তার নির্ভর করতে হয় না, তখন সকলেই তাঁকে এমন সম্ভ্রমের চোখে দেখতে লাগলো, যেমনটা এর পূর্ব্বে আর কখনো হয়নি।

দৃষ্টান্ত খুঁজতে আমি ইতালীর বাইরে যেতে চাইনে, কিম্বা বর্ত্তমান

ইতিহাসের গণ্ডি ছাড়িয়ে প্রাচীন ইতিহাসের পৃষ্ঠাও খুলতে চাইনে; কিন্তু সিরাকিউজবাসী হিয়েরোর (Hiero) দৃষ্টান্তটা উল্লেখ না করে পারছি না। এঁর কথা আমি পূর্ব্বেও বলেছি। বলেছি যে সিরাকিউজবাসীরা এঁকে তাদের সৈন্যের অধিনায়ক নিযুক্ত করেছিল। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বুঝলেন যে ভাড়াটে সৈন্য কোনো কাজের নয়। ইতালীর মত তখন সে দেশেও এই প্রথাই প্রচলিত ছিল। তিনি দেখলেন যে তাদের রাখতেও পারেন না, ছেড়ে দিতেও পারেন না; তখন তিনি তাদের মেরে ফেলবার ব্যবস্থা করলেন। এর পর থেকে তিনি দেশী সৈন্য নিয়েই যুদ্ধ করেছেন— বিদেশী সৈন্যের আর কখনো ধার ধারেন নি।

এছাড়া আমি খৃষ্টানী ধর্ম্মগ্রন্থ 'ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট্' থেকে এ বিষয়ের আর একটা দৃষ্টান্ত দিতে চাই। ডেভিড্ (David) সলের (Saul) নিকটে প্রস্তাব করলেন যে তিনি তাঁর পক্ষ হয়ে ফিলিষ্টাইন বীর গলিয়াথের (Goliath) সঙ্গে লড়াই করতে চান। সল রাজি হয়ে ডেভিডকে উৎসাহ দেবার জন্যে আপন অস্ত্র-শস্ত্রে তাঁকে সজ্জিত করে দিলেন। কিন্তু তার অঙ্গে পরিয়ে দেওয়া মাত্র তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। বললেন, সে অস্ত্র ব্যবহার তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না—তাঁর আপন অস্ত্র গুলেল বাঁশ ও ছোরা নিয়েই তিনি শত্রুর সঙ্গে লড়াই করবেন। মোট কথা, অন্যের অস্ত্র তোমার অঙ্গে খাপ খাবে না—খসে পড়ে যাবে, কিম্বা তার ভারে তোমাকে অবনমিত করে দেবে, অথবা তা তোমারই শৃঙ্খলস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে।

ফরাসীরাজ একাদশ লুইর পিতা সপ্তম চার্লস নিজের সাহস-বীর্য্য ও সৌভাগ্যবলে নিজের দেশকে ইংরাজের কবল থেকে মুক্ত করেছিলেন। সেই উপলক্ষে বিদেশী সৈন্য বাদ দিয়ে দেশী সৈন্য দ্বারা ফৌজ গড়ে

তোলার প্রয়োজনীয়তাও তিনি বিশেষ করে বুঝলেন। তাই এর পরেই তিনি পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য সম্বন্ধে নূতন আইন প্রণয়ন করলেন। পরে তার পুত্র লুই পদাতিক সৈন্যবিভাগ তুলে দিয়ে স্থইস অশ্বারোহী দ্বারা নিজের সৈন্য-বাহিনী গড়ে তুলেছেন। আজ যে সেদেশের লোক যে কোনো মুহূর্ত্তে বিপদ হতে পারে বলে আশঙ্কা করে, তার কারণই হচ্ছে লুইর এই ভুল এবং তার আনুসঙ্গিক ও অনুরূপ অন্যান্য কুব্যবস্থা। তিনি স্থইস সৈন্যের সুনাম বাড়িয়ে দেশী সৈন্যের মূল্য অনেকখানি নষ্ট করে দিয়েছেন। একে তো পদাতিক বিভাগ তিনি তুলেই দিয়েছেন—তারপরে দেশী অশ্বারোহী সৈন্য যা আছে, তাও তিনি বিদেশী সেনানায়কের অধীন করে দিয়েছেন। ফলে তারা স্থইসদের অধিনায়কতার ও সহযোগে যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত হওয়ায়, এখন আর বিশ্বাসই করতে পারে না যে স্থইসদের ছাড়াও তারা নিজেরা যুদ্ধ করে জয় লাভ করতে পারে। অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে তারা এখন আর স্থইসদের বিরুদ্ধে তো দাঁড়াতেই পারে না—স্থইসদের সাহায্য ছাড়া অপর কারো সঙ্গে লড়াই করেই সুবিধা করে উঠতে পারে না। এইভাবে গঠিত হওয়ায় ফরাসী সৈন্য এখন মিশ্র সৈন্যে পরিণত হয়েছে। তার একাংশ ভাড়াটে বিদেশী, অপরাংশ দেশী। এরূপ মিশ্র সৈন্য অবশ্যি কেবলমাত্র ভাড়াটে সৈন্য কিম্বা কেবলমাত্র মিত্র সৈন্য অপেক্ষা ভাল, কিন্তু তার চেয়েও অনেক ভাল ছেরেফ্ দেশী-সৈন্য দ্বারা গঠিত ফৌজ। ফরাসীদের দৃষ্টান্তই এ কথার প্রমাণ। সত্যিই ফরাসী রাজ্য অপরাজেয় শক্তি সামর্থ্য লাভ করতে পারতেন, যদি চার্লস কর্ত্তৃক প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থা লুই আরো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতেন, অন্তত যথাযথভাবে অব্যাহত রাখতেন।

কিন্তু স্বল্পবুদ্ধি মানুষ কোনো বিষয়ে হাত দিয়ে প্রথম মনে করে—সব ভাল, কিন্তু তার ভিতরে অন্য রকমের কিছু লুকিয়ে আছে কিনা, যা বুঝতে পারে না। পূর্ব্বে আমি বিদেশী ক্ষয় জ্বর সম্বন্ধে যা বলেছি, সেই অবস্থা আর কি। কোনো দেশশাসন করার দায়িত্ব যাদের ঘাড়ের উপরে, তারা যদি তাদের শাসন ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি বিষময় ফল ফলবার পূর্ব্বেই বুঝতে না পারে, তবে তাদের বুদ্ধিমান বলা যায় না। কিন্তু একথাও ঠিক যে এরূপ দূরদৃষ্টি কম লোকেরই আছে। রোম সাম্রাজ্যের অধঃপতনের কারণ খুঁজতে গিয়ে আমরা দেখি যেদিন থেকে গথদের সৈন্যদলে ভর্ত্তি করতে সুরু করেছে, সেই দিন থেকেই তাদের অধোগতির সূত্রপাত হয়েছে। কারণ সেই সময় থেকেই রোম সাম্রাজ্য তার স্বাস্থ্য ও শক্তি খোয়াতে সুরু করেছে, দেখতে পাই। ক্রমে যে সাহস বীর্য্য সেই সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্বরূপ ছিল, রোমানদের তার কিছুই আর রইলো না—অন্যেরা তার অধিকারী হল।

মোট কথা, কোনো রাষ্ট্রই নিরাপদ নয় তার নিজের সৈন্য না থাকলে। অধিকন্তু বিপদের দিনে আত্মরক্ষা করার শক্তি-সামর্থ্য ও সাহস-বীর্য্য তার নিজের না থাকায়, তাকে সম্পূর্ণরূপে শুভাদৃষ্টের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। জ্ঞানিগণ চিরকাল একথা বলেছেন যে, যে কর্ত্তৃত্ব ও কীর্ত্তি নিজের শক্তি সামর্থ্যের উপর স্থাপিত নয়, তার মত ক্ষণস্থায়ী ও অনিশ্চিত, জগতে আর কিছুই নেই। কোনো রাষ্ট্রের নিজের শক্তি বলতে বুঝবো, তার নিজের সৈন্য. অর্থাৎ যে সৈন্য সেই রাষ্ট্রের নাগরিক, বা সাধারণ অধিবাসী, কিম্বা যারা সেই রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ আয়ত্ত্বের মধ্যে আছে, তাদের ভিতর থেকে সংগৃহীত। এ ছাড়া আর সব রকমের সৈন্যই ভাড়াটে কিম্বা মিত্র সৈন্য সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। কি নিয়মে আপন সৈন্য গড়ে তুললে তারা সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম হয়ে উঠতে পারে,

তার সন্ধান আমার এই আলোচনা থেকেই পাওয়া যাবে। তা ছাড়া, বিশ্ববিখ্যাত আলেকজেণ্ডারের পিতা ফিলিপ এবং বহু গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্র যে সব পন্থা অবলম্বন করে নিজেদের সৈন্য বাহিনী গড়ে তুলেছে, তা-ও আলোচনা করে দেখা যেতে পারে। যে সব বিধি ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে এরা শক্তিশালী হয়েছে, তা সকলেরই অনুসরণ করা উচিত এবং আমিও তা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

যুদ্ধ কৌশল ও রাজার কর্ত্তব্য

অন্য ভাবনা-চিন্তা ছেড়ে দিয়ে রাজার বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত, কেমন করে সে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠবে। এ বিদ্যা তারই বিশেষ ভাবে শিক্ষণীয় যে দেশ শাসন করবে; এবং এ বিদ্যার গুণ এই যে যারা রাজা হয়ে জন্মেছে, তারাই যে শুধু এ বিদ্যাবলে আপন শাসন কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারে, তাই নয়—সাধারণ অবস্থার মানুষও রাজাসনের অধিকারী হতে পারে। অপর দিকে আবার যে সব রাজা যুদ্ধ শিক্ষার পরিশ্রম স্বীকার করতে রাজী না হয়ে, নিজের সুখও আরাম নিয়েই ব্যস্ত থাকে, তাদের রাজত্বের মেয়াদও অতি শীঘ্রই ফুরিয়ে আসে। ইতিহাসে এর দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষায় অবহেলাই রাজাদের রাজ্য হারাবার প্রথম ও প্রধান কারণ। আর যা করলে সাধারণ লোকেও রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হয়ে বসতে পারে, তা হচ্ছে এই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হওয়া। ফ্রানসেস্কো স্ফরজা এই সামরিক গুণে গুণশালী ছিল বলেই সাধারণ অবস্থা থেকে মিলানের ডিউক হতে পেরেছিল। কিন্তু তার ছেলেরা সামরিক শিক্ষার কষ্ট ও পরিশ্রম এড়িয়ে চলেছিল বলে ডিউকের পদটি থেকে সাধারণ অবস্থায় নেমে এসেছিলো। যে নিজে যুদ্ধ জানে না, তাকে নানা অসুবিধায় পড়তে হয়। তা ছাড়া সে লোকের ঘৃণার

পাত্র হয়। এ অবস্থা রাজার পক্ষে অত্যন্ত বিপদজনক। কখনো যাতে এরূপ অবস্থায় না পড়তে হয় তার ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। এ সম্বন্ধে আরো আলোচনা পরে করব। যে যুদ্ধ জানে, আর যে জানে না—এ দুয়ের মধ্যে কোনো তুলনাই চলেনা। যে যোদ্ধা, সে যে স্বেচ্ছায় যোদ্ধা নয়, তার অধীনতা মেনে চলবে—একথা কখনই যুক্তিসঙ্গত নয়। কিম্বা সশস্ত্র যুদ্ধবিশারদ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করে, যে যুদ্ধ জানে না, সে যে চিরদিন নিরাপদে থাকতে পারবে, তা কখনই হোতে পারে না। কারণ, একজন আর একজনকে মনে মনে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবে এবং অপরে তাকে সন্দেহ সব বিষয়ে করবে—এ অবস্থায় দুজনের বেশী দিন মিলেমিশে চলা সম্ভবপর হতে পারে না। অতএব যে রাজা যুদ্ধ বিদ্যা না শেখে, অন্যান্য বিঘ্ন বিপদ ছাড়া, তার সৈন্যেরাও তাকে সম্মানের চোখে দেখবে না, সে নিজেও তাদের উপরে আস্থা রাখতে পারবে না। তাই কোনো সময়েই রাজার এ বিষয়ে অমনোযোগী হওয়া উচিত নয়। এমন কি, যুদ্ধের সময় থেকে শান্তির দিনে তার আরো বেশী করে যুদ্ধের কুচ-কাওয়াজ ও কসরৎ নিয়ে ব্যস্ত থাকা উচিত। যুদ্ধ শিক্ষার দুই অঙ্গ—এক হাতে-কলমে কাজ-কর্ম্মের ভিতর দিয়ে শেখা, আর বই পড়ে শেখা।

শারীরিক অনুশাসন সম্বন্ধে তার উচিত সৈন্যদিগকে সর্ব্বদা কুচ-কাওয়াজের উপর রাখা ও তাদের ভিতরে যাতে শৃঙ্খলা ও অটুট নিয়মানুবর্ত্তিতা বজায় থাকে, সে বিষয়ে কড়া নজর রাখা। আর তার নিজের পক্ষে দরকার সর্ব্বদা শিকার নিয়ে ব্যস্ত থাকা। তাতে তার শরীর কষ্টসহিষ্ণু হয়ে উঠবে—দেশের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবে—তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হবে যে কেমন করে পাহাড় উচু হয়ে উপরে ওঠে ও অধিত্যকা কেমন

করে পাহাড়ের মাঝে ছড়িয়ে থাকে। এ ছাড়া দেশের নদী-সংস্থান ও জলাভূমির অবস্থা সম্বন্ধেও তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হবে। বিশেষ যত্নের সঙ্গে এ সব বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা তার পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। এই জ্ঞান তার পক্ষে দুই প্রকারে কার্য্যকরী হবে। এক তো এর ফলে সে নিজের দেশটাকে ভাল করে জানতে পারবে এবং তার ফলে দেশরক্ষার ব্যবস্থা করা তার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য হবে। দ্বিতীয়তঃ পরে যখন অন্য কোনো দেশের ভৌগোলিক সংস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা দরকার হবে, তখন সে নিজের দেশের অভিজ্ঞতা থেকেই অন্য দেশের অবস্থা সহজে বুঝতে পারবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, পাহাড়, উপত্যকা, মাঠ, নদী, জলাভূমি ইত্যাদি তাস্কানীতে যেমন, অন্য দেশেও প্রায় সেইরূপই—অন্ততঃ উভয় দেশের ভিতরেই যে এসব বিষয়ে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই এক দেশের অভিজ্ঞতা থেকে অপর এক দেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা খুবই সহজ। যে রাজার এ অভিজ্ঞতা নেই, সেনানায়কের অত্যাবশ্যকীয় গুণেরই তার অভাব। কেননা, এই অভিজ্ঞতা থেকেই তার আবশ্যকীয় শিক্ষা লাভ হবে যে কেমন করে শত্রুসৈন্যকে অতর্কিত আক্রমণ করতে হবে, নিজের সৈন্যাবাস কি রকম জায়গায় স্থাপন করতে হবে, আপন সৈন্যদের কোন্ পথে কি রকম ভাবে চালিয়ে নিতে হবে, কেমন করে ব্যূহ রচনা করতে হবে, কিম্বা কোনো সহর কিভাবে অবরোধ করলে তার সব দিক দিয়ে সুবিধা হবে।

ইতিহাসলেখকগণ একিয়ানদের রাজা ফিলোপোয়েমেনের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। বিশেষ করে, তিনি যে শান্তির সময়েও যুদ্ধের চিন্তা ভাবনায় মনকে ব্যস্ত রাখেন, তাঁর এই দৃষ্টান্ত তাঁরা সবাইকেই অনুসরণ করতে বলেছেন। তিনি যদি কখনো মফঃস্বলে কোথাও যেতেন, তবে

যেতে যেতে তিনি তার সঙ্গী-সাথীদের হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে তাদের সঙ্গে এই ভাবে তর্ক-বিচার স্থরু করে দিতেন—"আচ্ছা বল দেখি, শত্রু যদি থাকে ওই পাহাড়ের উপরে এবং আমরা যদি সৈন্য নিয়ে এসে এখানে উপস্থিত হই, তবে যুদ্ধে স্থবিধা কার বেশী হবে? সৈন্যের শ্রেণী ঠিক রেখে, এখান থেকে কি ভাবে এগিয়ে শত্রুর সম্মুখীন হওয়া উচিত? যদি পিছিয়ে আসতেই হয়, তাহলেই বা তা কি ভাবে করা উচিত? আর যদি শত্রুপক্ষ হঠে যেতে বাধ্য হয়, তবে তাদের অনুসরণ করাই বা কি ভাবে?" ইত্যাদি; তারপরে তিনি যেতে যেতে তাদের বলতেন—এরূপ স্থানে যুদ্ধ বাঁধলে কোন পক্ষের কি রকম অবস্থা হতে পারে। তিনি তাদের অভিমত শুনতেন এবং যুক্তিতর্ক দিয়ে নিজের অভিমত সপ্রমাণ করবার চেষ্টা করতেন। এই সব বিচার বিবেচনা ও তর্কবিতর্কের ফলে যুদ্ধের সময়ে তিনি কোন অপ্রত্যাশিত আকস্মিক বিপদে পড়লেও তিনি অনায়াসেই তা কাটিয়ে উঠবার ব্যবস্থা করতে পারতেন।

মানসিক অনুশীলনের জন্যে দরকার ইতিহাসের বই পড়া। এ সব বই পড়ে বিখ্যাত লোকদের কার্য্য-কলাপের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাবে—বুঝতে পারা যাবে যুদ্ধের সময়ে তারা কি ভাবে নিজেদের চালিয়েছেন,—জানতে পারা যাবে যারা জিতলো, তারা কেন জিতলো, কিম্বা যারা হেরে গেলো, তারা কেন হারলো এবং কেমন করেই বা পরাজয়ের সম্ভাবনা এড়িয়ে জয়ের পথে এগিয়ে যাওয়া যায়। মোদ্দা কথা হচ্ছে, সর্ব্বদা মহাজনদের পথ অনুসরণ করা উচিত। "মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ"। এই মহাজনেরাও তাদের পূর্ব্বে যারা বড় বড় কীর্ত্তি রেখে গেছেন, তাদের আদর্শ বলে মেনেছেন—তাঁদের কাজকর্ম্ম অনুসরণ করে চলেছেন। এরূপ প্রবাদ শোনা যায় যে

বিশ্ব-বিখ্যাত আলেকজেণ্ডারের আদর্শ ছিলেন আকিলিস, সিজারের ছিলেন আলেকজেণ্ডার এবং সিপিয়োর ছিলেন সাইরাস। জেনোফোনের (Xenophon) লেখা সাইরাসের (Cyrus) জীবনচরিত পড়লে সহজেই বোঝা যায় যে পরবর্ত্তী যুগে সিপিয়োর (Scipio) যা কিছু কীর্ত্তি, সবই সাইরাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। সিপিয়োর চরিত্রের নির্ম্মলতা, উদারতা, নম্রতা দয়া ইত্যাদি যা কিছু সব, সাইরাস সম্বন্ধে জেনোফোন যেমনটা লিখে গেছেন, তার সঙ্গে হুবহু মেলে। তাই বুদ্ধিমান রাজা শান্তির দিনে কখনো আলস্যে দিন কাটায় না—এমন কোন নিয়ম মেনে চলে তার দৈনন্দিন কাজ-কর্ম্মে যাতে ভবিষ্যত বিপদের দিনে তার যাত্রা পথের পাথেয় সংগ্রহ হতে থাকে। তার সর্ব্বদা দৃষ্টি থাকে যে তুর্দ্দিন যদি সত্যিই আসে, তবে সে যেন তাকে অতর্কিতে আক্রমণ করতে না পারে—যেন সে দেখতে পায় যে সে সর্ব্বদা লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সুনাম ও দুর্নামের হেতু

প্রজাদের সঙ্গে কিম্বা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে রাজার ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে এখনও বলা হয় নি। আমার পূর্ব্বেও এসম্বন্ধে আরো অনেকে অনেক কথা লিখে গেছেন। তাই আমার বিশ্বাস, অনেকেরই মনে হবে যে এ সম্বন্ধে আবার আমার পক্ষে কিছু বলা ধৃষ্টতা মাত্র। বিশেষতঃ তারা যখন দেখবে যে এ সম্বন্ধে আমার আলোচনার ধারাটা ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তীদের অনুরূপ নয়—বরং অনেকটা ভিন্ন রকমের, তখন তাদের এই ধারণা হয়তো আরো বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়াবে; কিন্তু আমি যখন চাই যে যারা আগ্রহ করে আমার লেখা পড়বে, তাদের যেন তা কাজে লাগে, তখন আমার পক্ষে কল্পনার উপর নির্ভর করে কতকগুলি আনুমানিক কথা না বলে, সত্য কথাটাই স্পষ্ট করে বলা উচিত। গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্র সম্বন্ধে অনেকে এমন সব চিত্র এঁকেছেন, যা কোনো দিন কেউ কোথাও দেখেনি কিম্বা তার অস্তিত্বও কোনো দিন কোথাও ছিল না। কোন্ অবস্থায় মানুষ কি ভাবে চলে এবং কি ভাবে চলা উচিত—এ দুইয়ের ভিতরে ঢের তফাৎ। 'কি ভাবে চলা উচিত'—এইটেই শুধু বিবেচনার বিষয় বলে যারা মনে করে—সঙ্গে সঙ্গে সেই অবস্থায় অন্যেরা কি ভাবে চলেছে, সে কথা বিবেচনা করে দেখে না,

তাদের সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। যারা আর কিছু গ্রাহ্য না করে, শুধু ধর্ম্ম বিশ্বাস মেনে চলতে চায়, তারা অচিরেই এমন অবস্থায় পড়ে যে তখন আর সেই পথে এক পা এগোলেও অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী।

অতএব রাজত্ব বজায় রাখতে হলে রাজার জানা চাই কেমন করে অন্যায় করতে হয় এবং বোঝা চাই কখন তা করা প্রয়োজন, কখন প্রয়োজন নয়। তাই নিছক কল্পনা ছেড়ে, আসল সত্য যা তা আমি বলবো। রাজন্যবর্গ কিম্বা তাদের মত যারা উচ্চ পদে অবস্থিত, তাদের কথা জন-সাধারণ সর্ব্বদাই আলোচনা করে থাকে। তাদের কার্য্য-কলাপে সাধারণতঃ এমন সব বিশেষত্ব ফুটে উঠে যার ফলে তারা লোকের প্রশংসা বা নিন্দা-ভাজন হয়ে থাকে। তাই লোকে বলে কাউকে দাতা, কাউকে কৃপণ—কাউকে মহানুভব, কাউকে হিংস্রস্বভাব—কাউকে দয়াশীল, কাউকে নির্দ্দয়—কাউকে বিশ্বাসী, কাউকে অবিশ্বাসী—কাউকে ভীরু ও মেয়েলি-স্বভাব কাউকে বীর, সাহসী—কাউকে সভ্য-ভব্য কাউকে ঔদ্ধত দাম্ভিক—কাউকে সাধু, কাউকে লম্পট—কাউকে সরল, কাউকে ধূর্ত্ত—কাউকে সহজ স্বভাব, কাউকে কড়া—কাউকে গম্ভীর, কাউকে তরল-মতি—কাউকে ধার্ম্মিক, কাউকে অবিশ্বাসী অধার্ম্মিক—ইত্যাদি। আমি জানি, সবাই বলবে যে এর মধ্যে যেগুলি মানুষের সদ্‌গুণ বলে পরিচিত, রাজা যদি শুধু সেইগুলির অধিকারী হন তা হলেই খুব ভাল হয়। কিন্তু মানুষ—মানুষ। তার পক্ষে সর্ব্ব দোষ বর্জ্জিত হয়ে কেবল গুণের অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। তাই তার সব দিক বিবেচনা করে দূরদর্শী হয়ে চলা দরকার। চরিত্রের যে সব অবশ্যম্ভাবী দোষের ফলে, তার রাজ্য-চ্যুত হওয়া সম্ভব বলে বোঝা যাবে, তা সম্পূর্ণ পরিহার করে চলতে না পারলেও, তা থেকে যাতে কোনো দুর্নামের সৃষ্টি না হয়,

তার ব্যবস্থা তাকে করতে হবে। তার জানতে হবে, কেমন করে তা সম্ভবপর হ'তে পারে। যে সব দোষের ফলে তার রাজ্য হারাবার ভয় নেই, সে সব দোষও পরিহার করে চলতে পারলে ভাল হয়—সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। এরূপ অবস্থায় এই সব দোষ বা ব্যসনের জন্যে তার সঙ্কোচ অনুভব করার কিছু নেই—তাতে তার বিশেষ কোনো ক্ষতি হবে না। তার পরে যে সব অন্যায় কাজ বা পাপানুষ্ঠান তার রাজত্ব রক্ষার পক্ষে একান্ত দরকার অর্থাৎ না করলে রাজত্ব রক্ষা করা অত্যন্ত শক্ত, তার জন্যে তার লোকনিন্দার ভয় করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ সব দিক ভেবে দেখলে বোঝা যাবে যে আপাতদৃষ্টিতে যা সৎকাজ বলে মনে হয়, তা-ই হয়তো পরিণামে ধ্বংসের কারণ হয়ে ওঠে এবং যা কুকাজ বা পাপ বলে মনে হয়, সেই পাপ-ই হয়ত নিরাপদ সমৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

উদারতা ও সঙ্কীর্ণতা

'রাজা উদার, দানশীল'—এরূপ খ্যাতি রটা রাজার পক্ষে খুব ভাল কথা। কিন্তু আপাততঃ খ্যাতি রটলেও যদি শেষ পর্য্যন্ত তা রক্ষা না হয়, অর্থাৎ তিনি যদি এমন ভাবে দান করতে থাকেন যার পরিণাম ফল সুনামের পরিবর্ত্তে দুর্নাম হয়ে দাঁড়ায়, তবে তাতে শুধু অর্থব্যয় ও অনর্থেরই সৃষ্টি হবে—লাভ কিছুই হবে না। যদি কেউ যথাযথভাবে দান করেন; অর্থাৎ দান করতে হ'লে সত্যি সত্যি যে ভাবে করা উচিত, সেই ভাবে করেন, তবে কেউ-ই তা জানতে পারবে না। কিন্তু কেউ যদি না জানতেই পারে, তবে তার কৃপণ বলে দুর্নাম রটতেও দেরী হবে না। তাই 'উদার', 'দানশীল'—এই খ্যাতি অর্জ্জন করতে হ'লে, দান করার সময়ে দাতাকে খুব জাঁক-জমকের সঙ্গে তা করতে হবে। কিন্তু বেশী জাঁক-জমক করতে গিয়ে তাঁর ধন-সম্পত্তি হয়তো তার পিছনেই খরচ হয়ে যাবে। ফলে ঠাট বজায় রাখতে তাঁকে অবশেষে বাধ্য হয়ে প্রজার কর-ভার বৃদ্ধি করতে হবে এবং নানা ফিকির-ফন্দি করে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা দেখতে হবে। কিন্তু তাতে একদিকে যেমন প্রজারা তাঁর উপরে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠবে, অন্য দিকে আবার তার আর্থিক সচ্ছলতা পূর্ব্বাপেক্ষা মন্দ হ'য়ে পড়ায় সকলেই

তাঁকে তুচ্ছজ্ঞান করবে। কাজে কাজেই এরূপ বদান্যতার ফল হবে এই যে তাতে লাভবান হবে দু’চার জন, কিন্তু অসন্তুষ্ট ও ক্ষুণ্ণ হবে বহু। আর তাঁর নিজের লাভ হবে, যখন তখন সামান্য কারণেই নানা দুর্ভোগ ও প্রথম বিপদের আঘাতেই রাজ্য-চ্যুতির আশঙ্কা। তার পরে যখন শেষ কালে তিনি ঠেকে শিখবেন, তখন হয়তো তিনি চাইবেন সে অবস্থা থেকে ফিরে আসতে। কিন্তু তার ফলে কৃপণ বলে তখনই তার দুর্নাম রটবে।

কাজে কাজেই লোককে জানিয়ে দান করতে গেলে যখন নিজের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী তখন দান করে কি লাভ? ও না করাই ভাল। তাতে যদি কৃপণ বলে দুর্নাম রটে তো রটুক—সে জন্যে ভয় করা উচিত নয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনো এরূপ দুর্নামকে গ্রাহ্য করে না। কেন না, লোকে যখন দেখবে যে পরিমিত ব্যয়ের দরুণ তাঁর টাকা পয়সার অভাব নেই—যে কোনো বিপদ থেকে আবার রক্ষা করার ক্ষমতা তাঁর যথেষ্ট, এবং প্রজার করভার বৃদ্ধি না করে তাঁর পক্ষে যে কোনো দুঃসাহসিক কাজে হাত দেওয়াও কিছুমাত্র শক্ত নয়, তখন সকলেই তার জয় গান গাইবে। অন্ততঃ দানশীল—উদার বলে খ্যাতি রটলে, লোকে তার যতটা কদর করতো, তার চাইতে যে এতে বেশী করবে, তাতে সন্দেহ নেই। কেননা, তাঁর দানশীলতার ফলে কয়জন লোকের উপকার হোতো? তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় বই তো নয়? কিন্তু তাঁর দানশীল না হওয়ার ফলে লোকের করভার বৃদ্ধি হবে না বলে, তাতে অনেক লোকের উপকার হবে এবং এই উপকারটাও তো একটা দান-ই বটে!

বর্ত্তমান সময়েও দেখতে পাই, যারাই বড় বড় কাজ করেছেন, তাদের সকলেরই নামে দুর্নাম রটেছে কৃপণ বলে। তবু তারাই

জীবন-সংগ্রামে কৃতকার্য্য হয়েছেন—অন্যেরা পারে নি। পোপ জুলিয়াসের সুনাম ছিল দানশীল বলে এবং সেই সুনামই তাঁকে অনেকটা সাহায্য করেছে পোপ পদ লাভ করতে। কিন্তু পোপ হয়ে যখন তিনি ফরাসী-রাজের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন, তখন আর তিনি সে সুনাম বজায় রাখতে চেষ্টা করেননি। তিনি জীবনে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়েছেন। কিন্তু সে জন্যে তিনি প্রজাদের কর বাড়াননি—সব খরচই তার নিজের সঞ্চয় থেকে সঙ্কুলান হয়েছে। বর্ত্তমান স্পেন-রাজ যদি প্রথমেই নাম কিনতে গিয়ে যথা-সর্ব্বস্ব খুঁইয়ে দিতেন, তবে তিনি যে বার বার যুদ্ধে নেমেছেন, তা-ও সম্ভবপর হ'ত না—কখনো কোনো যুদ্ধে নামলে, তাতেও জয়লাভ করতে পারতেন না।

অতএব কৃপণ বলে দুর্নাম রটলেও, রাজার সেজন্যে গ্রাহ্য করা উচিত নয়। একমাত্র কথা এই যে তিনি যদি প্রজার পকেটে হাত না দেন—যদি আত্মরক্ষার ক্ষমতা তার থাকে—যদি তিনি গরীব ও নীচ-মনা হয়ে না যান—যদি অন্যের ধন-সম্পদ কেড়ে-কুড়ে আনতে বাধ্য না হন, তবে এই দুর্নাম তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ এটা যদি দোষ হয়, তবে এই দোষই তাকে দেশ-শাসনের শক্তি দিবে।

কেউ হয়তো বলতে পারেন যে সিজার রাজ্য লাভ করেছিল এই 'দানশীল' সুনামের গুণে এবং আরো অনেকে উদার দানশীলতার ফলেই সর্ব্বোচ্চ পদবীতে আরোহণ করেছিলেন। সে কথারও আমি উত্তর দিচ্ছি। হয় তুমি সত্যি সত্যিই রাজা হয়েছ, কিম্বা রাজা হতে চলেছ। প্রথমে ক্ষেত্রে মুক্ত হস্তে দান করতে থাকা অত্যন্ত বিপদজনক। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দানশীল বলে পরিচিত হ'তে চেষ্টা করাই আবশ্যক। সিজার রোমে প্রাধান্য লাভ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রাধান্য লাভ করার পরেও যদি তিনি বেঁচে থাকতেন এবং খরচ না কমাতেন, তবে

তাঁর বেশী দিন রাজত্ব করতে হোতো না। আবার হয়তো কেউ বলবেন—"কেন? এমন তো অনেক দেখা গিয়েছে যে, দানশীল বলে খুব বিখ্যাত হয়ে-ও অনেক রাজা অনেক বড় বড় যুদ্ধও জিতে এসেছেন।" এ কথা যাঁরা বলেন, তাঁদের কথা সত্য হ'তে পারে—কিন্তু এ কথারও জবাব আছে। রাজারা যে দান করেন, সে দানের টাকা আসে কোথা থেকে? নিজের পকেট থেকে, কিম্বা প্রজাদের কাছ থেকে, অথবা সে টাকা অন্য কোনো লোকের। প্রথম ক্ষেত্রে একটু রয়ে সয়ে খরচ করা উচিত। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যখনি সুবিধা জুটবে, মুক্ত হস্ত হয়ে খরচ করা উচিত। আর যে রাজা যুদ্ধে নেমে লুট তরাজের উপর নির্ভর করে' সৈন্য-বাহিনীর ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করে, তার এই রূপ পরের টাকা নিয়ে কারবার করতে গিয়ে একটু বেশী উদার ও মুক্ত হস্ত না হলে চলে না। তা না করলে, সৈন্যেরাই শেষে বেঁকে দাঁড়াবে—তাঁর কথা শুনে চলতে চাইবে না। বিশেষতঃ যা তোমার নয়—তোমার প্রজাদেরও নয়, তা বিলিয়ে দিয়ে দানশীল সাজতে আপত্তি কি? সাইরাস, সিজার, আলেকজেণ্ডার—তারাও তো তা-ই করেছেন। অন্যের সম্পত্তি যদি তুমি উড়িয়েও দাও দান করে, তাতেও তোমার কোনো দুর্নামের কারণ নেই—বরং সুনামই বাড়বে তাতে করে। দুর্নাম হবে শুধু যদি তুমি তোমার নিজের সম্পত্তি এই ভাবে ফতুর করে দাও।

দানশীলতার ফলে মানুষের ক্ষয় ও অধোগতি এত শীঘ্র ঘনিয়ে আসে যে আর কিছুতেই তেমন হয় না। যতই তুমি দান করবে, ততই তোমার দানের ক্ষমতা কমে আসবে। ফলে তুমি ক্রমেই গরীব হতে থাকবে এবং তোমার দৈন্যের জন্যে লোকেও তোমায় ততই হেয় জ্ঞান করতে থাকবে। আর যদি তখন তুমি দৈন্যের হাত থেকে উদ্ধার

পাওয়ার চেষ্টা কর, তবে তোমায় বাধ্য হয়ে অন্যের উপরে জুলুম চালাতে হবে। কিন্তু জুলুম করতে গিয়ে তুমি সকলেরই ঘৃণা পাত্র হয়ে পড়বে। অথচ রাজার পক্ষে প্রজার ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র হওয়ার মত সর্ব্বনাশজনক অবস্থা আর হতে পারে না। এ অবস্থা যাতে কখনো হ'তে না পারে, রাজার সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। কিন্তু অতিরিক্ত দানশীল হলে রাজার শেষ পর্য্যন্ত এই অবস্থা না হয়ে পারে না। অতএব দানশীল বলে খ্যাতি লাভ করার চেয়ে, লোকের যদি কৃপণ বলে দুর্নাম রটায়, সে-ও ভাল এবং সেই ভাবে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাতে বড় জোর লোকে তোমায় দু'চার কথা মন্দ বলবে, কিন্তু কেউ তোমায় ঘৃণা করবে না সেজন্যে। কিন্তু দান করে সুনাম কিনতে গিয়ে যে তুমি শেষে লোকের উপর জুলুম করবে এবং তার ফলে লোকে তিরস্কারও করবে, ঘৃণাও করবে, তার চেয়ে তো তা অনেক ভাল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

দয়া ও নির্দ্দয়তা

ভালবাসার পাত্র হওয়াই ভাল, না ভয়ের পাত্র ?

রাজার অন্যান্য যে সব দোষ-গুণের উল্লেখ করেছি, এখন সেই সম্বন্ধে বলবো প্রত্যেক রাজারই এই আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত বটে, যে লোকে যেন তাকে দয়াশীল বলে জানে—কেউ যেন তাকে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর মনে না করে। কিন্তু এ সম্বন্ধেও তার বুঝে-শুনে চলা উচিত—অতিরিক্ত করতে যাওয়া ঠিক হবে না। সিজার বর্জ্জিয়াকে সবাই নিষ্ঠুর মনে করতো। কিন্তু তা সত্বেও তিনি রোমাগ্‌নাতে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করতে ও তথাকার লোকদের সঙ্ঘবদ্ধ ও অনুগত করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঘরোয়া যুদ্ধে পিষ্টোরিয়া ধ্বংস হয়ে গেল, তবু ফ্লোরেন্স-বাসীরা তার রক্ষার ব্যবস্থা করলো না, পাছে নিষ্ঠুর বলে দুর্নাম রটে, এই ভয়ে। তাদের চেয়ে সিজার বর্জ্জিয়া যা করেছেন, তা যে অনেক বেশী দয়ার কাজ হয়েছে—একথা একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায়। অতএব রাজা যতক্ষণ তার প্রজাদের একতাবদ্ধ ও রাজভক্ত করে রাখতে পারেন, ততক্ষণ নিষ্ঠুর বলে কিছু কিছু দুর্নাম রটলেও, সেজন্যে গ্রাহ্য করা উচিত নয়। রাজা অতিরিক্ত উদার ও দয়াশীল হ'লে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। ফলে চুরি, ডাকাতি,

হত্যা বেড়ে যায়। সব প্রজাই তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু তিনি যদি একটু শক্ত হয়ে দেশ-শাসন করেন, তবে তাতে দু'চার জনের মাত্র ক্ষতি হবে এবং সেই দুচার জন লোকেরই মাত্র অসন্তোষের কারণ ঘটবে। অধিকাংশ লোকের তাতে কোনো ক্ষতি বৃদ্ধির কারণ থাকবে না। মোটের উপর তাতেই রাজ্যের মঙ্গল হবে।

বিশেষতঃ যারা নূতন রাজা হবেন, তাদের পক্ষে খানিকটা নিষ্ঠুরের মত কাজ না করে উপায় নেই। কেন না নূতন রাষ্ট্রের বিপদ পদে পদে। বিপদ কাটিয়ে উঠতে হলে কখনো কখনো নিষ্ঠুর হ'তে হবেই। তাই লোকেও নিষ্ঠুর বলে তার অপবাদ দেবেই! মহাকবি ভার্জ্জিল ও দিদোর (Dido) মুখ দিয়ে এই কথাই বলিয়েছেন। ডিডো বলছেন—

"আমি কি চেয়েছি এই রাজ সিংহাসন,
এই শিশু-রাষ্ট্র যার পালন পোষণ
কঠোর কঠিন করে না করিলে নয়।
কার এ নির্দ্দেশ, বল, এমন দুর্জ্জয় ?
শাসন পেষণ আর যত অত্যাচার—
যা কিছু হতেছে, সব নির্দ্দেশিছে নিয়তি আমার।"

তা সত্ত্বেও তার খুব সাবধানে চলা উচিত। যে কোনো বিশ্বাসে ভর ক'রে অমনি কাজে প্রবৃত্ত হওয়া ঠিক নয়, কিম্বা ভয় পেয়েছে এমন ভাবও কখনো দেখানো উচিত নয়। বিবেচনার সঙ্গে যথোচিত দয়া-দাক্ষিণ্য দেখিয়ে সংযত-শান্তভাবে তার চলা উচিত। লোকের উপরে অতিরিক্ত বিশ্বাস স্থাপন করে তার অসাবধান হ'লেও চলবে না, কিম্বা সকলকেই অবিশ্বাস করে তার শাসন তাদের পক্ষে একেবারে দুর্ব্বিসহ করে তুললেও চলবে না।

এখানে প্রশ্ন ওঠে, রাজার পক্ষে লোক প্রিয় হওয়াই ভাল, না লোকের ভীতি স্বরূপ হওয়াই ভাল ? এ কথার উত্তর হচ্ছে, উভয়ই যদি একজনের পক্ষে হওয়া সম্ভব হয়, তবে তা-ই ভাল। কিন্তু সেরূপ হওয়া যখন সম্ভব নয়—লোকপ্রিয়তা ও লোক-ভীতি এই দুইয়ের একটা বেছে নেওয়া ছাড়া যখন উপায় নেই, তখন এ দুয়ের মধ্যে ভীতি-স্বরূপ হয়ে থাকাই অনেক নিরাপদ। কারণ মানুষ সাধারণতঃই অকৃতজ্ঞ, চঞ্চলমতি, অবিশ্বাসী, লোভী ও ভীরু হয়ে থাকে। যতক্ষণ তোমার অভ্যুদয় ও জয় অটুট আছে, ততক্ষণ তারা সম্পূর্ণই তোমার পক্ষে। তারা তাদের গায়ের রক্ত, সম্পত্তি, জীবন, আপন সন্তান—সবই তোমার জন্যে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত, যতক্ষণ না তার সত্যি প্রয়োজন উপস্থিত হয়। কিন্তু যখনি সময় আসবে, তখন আর তোমার কাছ দিয়েও ঘেঁষবে না। যে রাজা লোকের লম্বা প্রতিশ্রুতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে আর কোনো রকমের সতর্কতা অবলম্বন অনাবশ্যক মনে করেন, তার সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। কেননা বন্ধুত্ব, টাকা দিয়ে কিনতে হয়—শুধু মনের ঔদার্য্য ও মহানুভবতা দ্বারা তা লাভ করা যায় না। তাই বিনা পয়সার বন্ধুত্ব যদি জোটেও, তা স্থায়ী হয় না এবং বিপদের দিনে তার উপরে মোটেই ভরসা করা যায় না। মানুষের মনে ভালবাসার চেয়ে ভয়ের শক্তি বেশী। ভক্তি, সম্মান ও ভালবাসার পাত্রকে মানুষ ততটা গ্রাহ্য করে না, যতটা করে ভয়ের পাত্রকে।

ভালবাসা থাকে, যত দিন মানুষের কৃতজ্ঞতা বুদ্ধিটা বেঁচে থাকে। কিন্তু মানুষ স্বভাবতই এমন হীন-চেতা নীচবুদ্ধি যে নিজেদের স্বার্থের জন্যে সে যে কোনো সময়ে ভালবাসাও বন্ধুত্ব জলে ভাসিয়ে দিতে পারে। কিন্তু শাস্তিকে সবাই ডরায়। যদি জানে যে কঠিন শাস্তি

পেতে হবে, তবে তারা সব সময়েই তোমার অনুসরণ করে চলবে—কখনো তার অন্যথা হবে না।

কিন্তু লোকের মনে এতটা ভীতি উৎপাদন করা ঠিক নয়, যাতে লোকে তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করিতে আরম্ভ করে। লোকের ভালবাসার পাত্র না হয় না-ই হ'তে পারা গেল। কিন্তু তার সঙ্গে ঘৃণার পাত্রও যাতে না হোতে হয়, সে বিষয় বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। কেননা, যতক্ষণ সে ঘৃণার পাত্র হয়ে না পড়ে, ততক্ষণ তার লোকের ভীতি-স্বরূপ হ'য়ে ওঠা সত্ত্বেও কোনো ক্ষতি হবে না। আর যতক্ষণ সে লোকের সম্পত্তিতে এবং তাদের মহিলাদের সম্মানহানিজনক কোনো কাজে হাত না দিবে, ততক্ষণ তার লোকের ঘৃণার পাত্র হওয়ারও ভয় নেই। তা ছাড়া কারো জীবনের উপরে হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক হয়ে পড়লে, তার কারণটা হওয়া চাই সম্পূর্ণ ন্যায় সঙ্গত ও যথেষ্ট স্পষ্ট, যাতে তার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে কারো মনেই কোনো সন্দেহ না থাকে। সব চেয়ে বড় কথাই হচ্ছে, অপরের সম্পত্তিতে হাত না দেওয়া। মানুষ বাপের মৃত্যু যত সহজে ভুলতে পারে, পৈতৃক সম্পত্তির মায়া তত সহজে কাটাতে পারে না। সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার অজুহতের অবশ্য কখনই অভাব হয় না। দস্যুতা দ্বারা টাকা আয়ের পথে যে একবার পা দিয়েছে, পরস্ব অপহরণের অজুহত সে সব সময়েই খুঁজে পাবে। কিন্তু কারো জীবন নিয়ে টানাটানি করার অজুহত সব সময়ে জোটে না—জুটলেও সামান্য দেরী হ'লেই তার যুক্তিযুক্ততা ফুরিয়ে যায়। কিন্তু যখন কোনো রাজা বহু সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যুদ্ধে ব্যাপৃত হন, তখন তাঁর এমন কাজ না করে উপায় নেই, যাতে লোকে তাঁকে নিষ্ঠুর বলে মনে করতে পারে; কিন্তু সেজন্যে তার গ্রাহ্য করা উচিত নয়। অন্যথা তাঁর পক্ষে সৈন্যদের মানিয়ে রাখা

সম্ভবপর হবে না, কিম্বা তারা তাদের কাজকর্ম্মেও মনোযোগী হবে না।

কার্থেজবাসী হানিবল সম্বন্ধে বহু বিস্ময়কর কাহিনী প্রচলিত আছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে এই যে তিনি নানা দেশীয় ও বিভিন্ন রকমের বহু সৈন্য নিয়ে নিজের দেশ থেকে বহু দূরে এসেও যুদ্ধ চালিয়েছেন, কিন্তু তার সৈন্যদের পরস্পরের ভিতরে বিবাদ-বিসম্বাদ কিংবা হানিবলের প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র অসন্তোষ কখনো গজিয়ে উঠতে পায়নি। প্রধানতঃ তার অমানুষিক নিষ্ঠুরতার ফলেই এমনটা সম্ভবপর হয়েছে। এ ছাড়া অবশ্য তার সাহস-বীর্য্যেরও সীমা ছিল না। ফলে সৈন্যেরা একদিকে যেমন তাকে যমের মত ভয় করত, তেমনি নিরতিশয় সম্মানের চোখেও দেখ্‌তো। কিন্তু প্রয়োজন অনুসারে নিষ্ঠুর হ'তে না পারলে, শুধু সদ্‌গুণোচিত সাধু প্রচেষ্টা পারতো না। অদূরদর্শী লেখকেরা এক দিক থেকে দেখে তার কাজের প্রশংসা করেছে বটে, কিন্তু অপর দিক থেকে দেখে, না বুঝে অযথা তার নিন্দা করছে। অথচ তার সেই প্রশংসাযোগ্য কাজটাও সম্ভবপর হয়েই উঠতো না, যদি যে কাজটাকে তারা নিন্দা করেছে, তা তিনি না করতেন। এ কথার প্রমাণ স্বরূপ সিপিয়োর (Scipio) দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি নিজে ছিলেন অতি চমৎকার লোক—তেমন লোক কোন যুগেই বড় বেশী মেলে না। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধেও তাঁর সৈন্যেরা স্পেনে থাকা কালে বিদ্রোহ করেছিল। এর একমাত্র কারণই হচ্ছে তাঁর ক্ষমাশীলতার পরিমাণ ছিল না। তার ফলে সৈন্যেরা শত অন্যায় করেও রেহাই পেতো। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা কখনই সামরিক শৃঙ্খলার পরিপোষক নয়। এজন্যে ফাবিয়াস মাক্‌সিমাস (Fabius Maximus) সেনেটের অধিবেশনে দাঁড়িয়ে তাঁকে তিরস্কার করেছেন এবং সিপিয়ো

রোমান সৈন্যদের খারাপ করে দিচ্ছেন বলে গালি দিয়েছেন। সিপিয়োর এক দূত লোক্রিয়ানদের (Locrians) উচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। কিন্তু সিপিয়ো সে অন্যায়ের কোনো প্রতিকারও করলেন না—দূতের সে ঔদ্ধত্যের কোনো শাস্তিবিধান করাও আবশ্যক মনে করলেন না। এর একমাত্র কারণই হচ্ছে, তাঁর শান্ত স্বভাবের মধ্যে সে বজ্র-কঠিন দিকটা ছিল না—সবই তিনি সহজভাবে নিতেন। তাঁর এই মৃদু স্বভাবের জন্য তাকে সমর্থন করতে গিয়ে সেনেট সভায় কোনো এক ব্যক্তি বলেছিলেন—"এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা অপরের ভুল সংশোধনের চেয়েও নিজে কেমন করে ভুল এড়িয়ে চলতে পারবেন, তা বোঝেন বেশী।" কিন্তু অব্যাহত ভাবে বরাবরই যদি তিনি রাজ্যের সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকতেন, তবে তাঁর মৃদু স্বভাবের ফলেই তাঁর খ্যাতি সব নষ্ট হয়ে যেতো। কিন্তু তাঁকে সেনেটের কর্ত্তৃত্বাধীনে কাজ করতে হোতো বলে, তাঁর নিজের দোষ যেতো চাপা পড়ে—এমন কি তাঁর যা দোষ, তা-ই লোকের চোখে গুণ বলে প্রতিভাত হোতো।

এখন আবার ফিরে আসা যাক আমাদের সেই গোড়াকার প্রশ্নে যে প্রজারা রাজাকে ভালবাসবে, না ভয় করবে—কোন্‌টা রাজার পক্ষে মঙ্গল? এ সম্বন্ধে আমার শেষ কথা এই যে, লোকে ভালবাসে তাদের আপন ইচ্ছায়, কিন্তু ভয় করে রাজার কাজের ফলে, অর্থাৎ তা রাজার নিজের ইচ্ছা সাপেক্ষ। রাজা যিনি বুদ্ধিমান হবেন, তিনি সর্ব্বদা নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করবেন—এমন কোনো কিছুর উপরেই নির্ভর করতে যাবেন না, যা তাঁর নিজের আয়ত্তে নেই—সম্পূর্ণ অন্যের ইচ্ছা সাপেক্ষ। শুধু এক বিষয়ে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে,—যা পূর্ব্বেই একবার বলেছি—লোকের ঘৃণার পাত্র যাতে তাঁর কখনো না হোতে হয়।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বিশ্বাস-রক্ষা

যে রাজা ছল-চাতুরী ছেড়ে সততা অবলম্বন করে ও বিশ্বাস রক্ষা করে চলে, কে না তাঁর প্রশংসা করে? এ সবই খুব ভাল, স্বীকার করি। কিন্তু আমরা অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পাই যে যারাই বড় হয়েছে ও বড় বড় কাজ করে গিয়েছে, তারা কেউই জীবনে বিশ্বাস রক্ষা করাটাকে বড় স্থান দেয় নি। আমরা জানি যে তারা কত সময়ে ছল-চাতুরীর বলে অন্যের বুদ্ধি গুলিয়ে দিয়েছে এবং অবশেষে তাদেরই নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে করে নিয়েছেন, যারা তাদের কথার উপর নির্ভর করে চলেছে। একথা ঠিক জেনো যে প্রতিযোগিতা বা দ্বন্দ্বের দুই পথ আছে। এক আইনের পথ, দ্বিতীয় গায়ের জোরের পথ। এর প্রথমটা মানুষের পথ, দ্বিতীয় পশুর। কিন্তু প্রথম পথে যখন কার্য্যোদ্ধার হয় না এবং এরূপ অবস্থাই অনেক সময়ে হয়ে পড়ে, দেখা যায়, তখন দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। তাই রাজার পক্ষেও ভাল করে জানা চাই যে আবশ্যক মত কেমন করে পশুও হোতে হয়, আবার মানুষ মানুষই থেকে যেতে হয়। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ এই কথাটাই আলঙ্কারিক ভাষার আবরণে বলতে চেয়েছেন, যখন তারা বলেছেন যে গ্রীকবীর আকিলিস (Achilles) ও আরও অনেক

রাজাকে খিরোন (Chiron) নামক অর্দ্ধঘোটকাকৃতি এক লোকের হাতে দেওয়া হয়েছিল তাদের প্রতিপালন ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থার জন্যে। অর্থাৎ তারা রাজাদের তৈয়ারী করে তুলবার ভার ন্যস্ত করতো এমন একজন লোকের হাতে যে অর্দ্ধেক পশু, অর্দ্ধেক মানুষ। তার মানেই হচ্ছে যে, দেশ শাসনের কাজে রাজাদের কখনো পশুসুলভ বৃত্তির প্রাধান্য দিতে হবে, কখনো মানবসুলভ বৃত্তির এবং এই দুয়ের ভিতরে শুধু একটা মাত্র বৃত্তির প্রয়োগে স্থায়ী সুফল লাভের সম্ভাবনা নেই। অতএব রাজাদের যখন পশুত্ব অবলম্বন না করে উপায় নেই, তখন পশুদের মধ্যে শেয়াল ও সিংহের গুণ আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করা উচিত। সিংহের বীরত্ব আছে, কিন্তু ফাঁদের মায়াজাল কি করে এড়াতে হয়, তা জানে না। শেয়াল যদিও খুব ধূর্ত্ত, কিন্তু নেকড়ে বাঘের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে না। তাই রাজাকে শেয়াল হয়ে ফাঁদ খুঁজে বের করতে হবে এবং সিংহ হয়ে নেকড়ে বাঘের দলকে সন্ত্রস্ত রাখতে হবে। যারা শুধু সিংহের শূরত্বের উপর নির্ভর করে চলতে চায়, চারদিক বিবেচনা করে চলার শক্তি তাদের ভিতরে গজাবে না। অতএব কোনো বুদ্ধিমান রাজাই সব সময়ে বিশ্বাস রক্ষা করে চলতে পারবে না—চলাও তার পক্ষে উচিত হবে না। চুক্তি মাফিক কাজ করলে যখন তার নিজের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা, কিম্বা যে কারণে তিনি চুক্তিবদ্ধ হতে রাজি হয়েছিলেন, সে কারণ যখন অপগত হয়েছে, তখন আর সে চুক্তি পালনের জন্যে তার মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। মানুষের মনে যদি ময়লা না থাকতো, তার প্রকৃতি যদি সৎ ও সুন্দর হোতো, তবে অবশ্য এই নীতি খাটতো না। কিন্তু তা নয়—মানুষ স্বভাবতই অসৎ, মন্দ—তার স্বার্থের পরিপন্থী হলে সে কখনই তোমার সঙ্গে বিশ্বাস রক্ষা করবে না। কাজেই, তোমারই বা কি দায়

পড়েছে যে তুমি তাদের সঙ্গে বিশ্বাস রক্ষা করে চলবে? তার পরে, কেন বিশ্বাস রক্ষা করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয় তার কারণ যদি দেখাতে চাও, তবে সে কারণেরও কখনই অভাব হবে না। বর্ত্তমান ইতিহাসের পাতা থেকে এ কথার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দেখানো যায়। রাজাদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে কত চুক্তি ও সন্ধি সর্ত্ত যে নাকচ হয়ে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই। এদের দৃষ্টান্ত এই কথাই প্রমাণিত করে যে, যিনি সব চেয়ে ভাল করে শৃগালত্ব প্রকাশ করতে পারেন কাজে কর্ম্মে, তিনিই সব চেয়ে বেশী কৃতকার্য্য হয়েছেন।

কিন্তু নিজের স্বভাবের এই বিশেষত্বটাকে লোকের কাছে প্রচার করে বেড়ালে চলবে না—কপটতা ও ছল অবলম্বনে তাকে ঢেকে-ঢুকে চলতে পারা চাই। মানুষ সাধারণতঃই সরল ও বর্ত্তমান প্রয়োজনের তাড়ায় অস্থির। তাই যে কপটতা অবলম্বন করে ঠকাতে চায়, তার ঠকাবার লোকের অভাব হবে না কোনও দিন। এখানে বর্ত্তমান কালের একটা দৃষ্টান্ত আমি না উল্লেখ করে পারছিনে। তা হচ্ছে পোপ ষষ্ঠ আলেকজেণ্ডারের কথা। লোককে ঠকানোই ছিল যেন তাঁর ব্যবসা—এ ছাড়া তাঁর যে আর কোনো চিন্তা ছিল তা-ও মনে হয় না। কিন্তু লোকের সঙ্গে ব্যবহারে এত প্রতারণা করেও তাঁর প্রতারণার পাত্রের অভাব হয়নি কখনো। তাঁর মত এমন লোক বড় দেখা যায় না, যে এত জোর দিয়ে কথা বলে, কিম্বা কথায় কথায় এমন অকুণ্ঠভাবে শপথ করে,—অথচ পরে তদনুসারে কাজ করার নামটিও করে না। তবুও তাঁর প্রত্যেকটা প্রতারণাই তিনি যেমন ভাবে চাইতেন, ঠিক তেমনিভাবেই কার্য্যকরী হোতো।

অতএব যে সব সদ্‌গুণের আমি উল্লেখ করেছি, তার সবগুলিই যে কোনো রাজার থাকা আবশ্যক, তা নয়। কিন্তু সবগুলিই তাঁর

আছে—এরূপ ভাণ করার দরকার আছে। অধিকন্তু একথাও আমি বলবো যে সে গুণগুলি থাকা ও সেগুলি অব্যাহত রেখে সব সময়ে চলা রাজার পক্ষে একান্ত ক্ষতিকর। কিন্তু এমন ভাবে চলা চাই, যাতে লোকে মনে করে যে সেগুলি তাঁর আছে—তা খুব ভাল ও মঙ্গলকর। ক্ষমাশীল, বিশ্বাসী, দয়াবান, ধাম্মিক ও সৎ বলে লোকের চোখে প্রতিভাত হওয়া ভাল এবং সত্যি সত্যি সেগুলি থাকাও মন্দ নয়; কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে মনটাকে এমনভাবে তৈয়ারী করে রাখতে হবে যাতে দরকার হলে তুমি তার উলটোটাও সাজতে পার এবং কি করে বিপরীত গুণগুলি ব্যবহার করা যায় বাস্তব কাজে, তা-ও তোমার জানা থাকা চাই।

এ কথা বোঝা দরকার যে, যে-সব কাজের ফলে মানুষ সাধারণতঃ লোকের সম্মানের পাত্র হয়, রাজা যে সব সময়ে শুধু সেই রকমের কাজই করতে পারবেন, তার কিছু নিশ্চয়তা নেই—বিশেষতঃ নূতন রাজার পক্ষে তা একেবারেই অসম্ভব। রাজ্যরক্ষার জন্যেই অনেক সময়ে রাজাকে বিশ্বস্ততা, বন্ধুত্ব, মনুষ্যত্ব ও ধর্ম্ম-বিধানের বিরোধী অনেক কাজ বাধ্য হয়ে করতে হয়। তাই রাজা সব সময়ে নিজের মনটাকে প্রস্তুত রাখবেন যাতে দরকার মত তাকে যে কোনো দিকে ঘুরিয়ে নিতে পারেন; যখনই হাওয়া ঘুরে যাবে—অদৃষ্টের গতি পরিবর্ত্তনের দিকে মুখ ফেরাবে। কিন্তু নিতান্ত আবশ্যক না হলে, যা ভাল, যা ন্যায়সঙ্গত, কখনো তার অন্যথা করা উচিত নয়। কিন্তু যখনি দরকার হয়ে পড়বে, তখনি মন্দটাও কেমন করে করতে হয়, তা জানা চাই।

এই কারণে কথাবার্ত্তাতেও রাজাকে সাবধান হোতে হবে। এমন কথা যেন কখনও তাঁর মুখ দিয়ে না বেরোয়, যাতে লোকের মনে সন্দেহ হ'তে পারে যে উপরোক্ত পাঁচটা গুণের কোনো দিক দিয়ে তার কোনো

অভাব আছে। যারা তাকে দেখে ও তাঁর কথা শুনতে পায়, তাদের যেন সর্ব্ব সময়ে এই ধারণা জন্মে যে রাজা বড়ই ক্ষমাশীল, বিশ্বাসী, দয়ালু, সৎ ও ধার্ম্মিক। সব চেয়ে বেশী দরকার হচ্ছে, লোকের চোখে ধার্ম্মিক বলে প্রতিভাত হওয়া। বাইরে থেকে দেখতে লোকের কি মনে হয়, সেইটেই হচ্ছে বড় কথা। কেন না মানুষ বিচার করে চোখ দিয়ে যতটা, ততটা হাতে-নাতে পরীক্ষা করে নয়। তার পরে, দূর থেকে তোমায় সবাই দেখতে পায়, কিন্তু তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবার সুযোগ কম লোকেরই হবে। লোকে যা চোখে দেখতে পায় তা শুধু বহির্ব্বাসটা, কিন্তু আসলে তুমি যে কি, তা খুব অল্প লোকেই জানতে পারে। যারা জানতে পারে তারাও অধিকাংশ লোকের মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস পায় না—বিশেষতঃ রাষ্ট্রের বিপুল শক্তিও যখন রয়েছে সেই মতেরই পিছনে সদা জাগ্রত হয়ে। কাজের বিচার করে মানুষ ফল দেখে। বিশেষতঃ রাজাদের কাজের বিরুদ্ধ সমালোচনায় বিপদ আছে বলে তাদের সম্বন্ধে এ কথা আরো বেশী করে খাটে।

এই কারণে রাজা যেমন করেই হোক রাজ্য জয় ও তা রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন। উপায় তিনি যা-ই অবলম্বন করে থাকুন না কেন, লোকে তাকেই সৎউপায় বলে মেনে নেবে এবং সকলেই তার সুনাম গাইবে। কেননা, সাধারণ লোকে আপাতদৃষ্টিতে যা বোঝে, তা-ই নিয়েই খুসী থাকে এবং সব কাজেরই ফল দেখে তার বিচার করে। দুনিয়ায় সাধারণ লোকই প্রায় সব। কেননা অসাধারণ দু'চার জনের জায়গা তখনই হয়, যখন অধিকাংশ দাঁড়াবার জায়গা খুঁজে পায় না।

আজকের দিনেও এমন একজন রাজা আছেন—নামটা করা অবশ্যি ঠিক হবে না—যার মুখে সর্ব্বদা লেগেই আছে শান্তি ও বিশ্বাস-

পরায়ণতার কথা—এই কথা প্রচার করাই যেন তাঁর জীবনের ব্রত। অথচ কাজে এই কথার বিরুদ্ধতা করতে তাঁর মতও আর কেউ নেই। এই দু'য়ের যে কোনো একটা যদি তিনি সত্যি সত্যিই মেনে চলতেন সমস্ত কাজ কর্ম্মে, তবে তার ফলে যে তার সুনামও ডুবতো—রাজত্বও লোপ পেতো, তাতে সন্দেহ নেই।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

অবজ্ঞা ও ঘৃণার পাত্র না হওয়া

পূর্ব্বোল্লিখিত রাজোচিত গুণাবলীর মধ্যে যেগুলির গুরুত্ব বেশী, তার আলোচনা শেষ করেছি। যা বাকী আছে, সেগুলির আলোচনা এখন মোটামুটি ভাবে করবো। এই একটা কথা বললেই অন্যান্য সব গুণগুলির কথা বলা হয়ে যাবে, যে কাজের ফলে রাজা সকলের অবজ্ঞা বা ঘৃণার পাত্র হয়ে পড়তে পারেন, সে কাজ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য ; এবং এই বিষয়ে তিনি যত কৃতকার্য্য হতে পারবেন, তত তাঁর অন্য কোনো প্রকার দুর্নামের জন্যে দুর্ভাবনার প্রয়োজন থাকবে না।

রাজা যদি লুণ্ঠন-প্রিয় হন এবং যদি লোকের সম্পত্তিতে কিম্বা মহিলাদের সম্মানের উপরে হস্তক্ষেপ করেন, তাতে তিনি যেমন সকলের ঘৃণার পাত্র হয়ে পড়বেন, তেমন আর কিছুতেই নয়। তাই এই দুটি কাজ থেকে তাঁর সব সময়ে হাত গুটিয়ে রাখতে হবে। এ কথা অবশ্যি পূর্ব্বেও একবার বলা হয়েছে। সম্পত্তি ও সম্মান অটুট অব্যাহত থাকলে, অধিকাংশ লোকই খুসী থাকবে। তারপরে যে দু'চার জন রইলো, যাদের অপরিমিত উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বোঝাপড়ার আবশ্যক হবে, নানা উপায়ে সহজেই তাদের দমনে রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারবে।

লোকের যখন মনে হয় যে রাজা চঞ্চল-প্রকৃতি, লঘু-চেতা, দুর্ব্বল-মনা নীচ-স্বভাব কিম্বা দৃঢ়তা-বিহীন, তখন সকলেই তাকে অবজ্ঞা করতে আরম্ভ করে। অতএব সর্ব্বথা এই সব দুর্ব্বলতা পরিহার করে চলতে হবে। লোকে যাতে সকল কাজে তাঁর মহত্ত্ব, তাঁর সাহস-বীর্য্য, তাঁর গুরু-গাম্ভীর্য্য ও মনের বলের পরিচয় পায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রজাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ব্যবহারে তাঁর এমন ভাবে চলা দরকার যাতে সবাই মনে করে যে 'হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না'—যাতে সকলের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করা কিম্বা তাঁকে ফাঁকি দিয়ে কার্য্যোদ্ধার করা চলবে না। সেই রাজাকে সকলেই মহা সম্মানের চোখে দেখে, যিনি এরূপ ধারণা লোকের মনে বদ্ধমূল করে দিতে পারেন। আর যিনি এরূপ সম্মানের পাত্র হতে পারেন, লোকে সহজে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে চায় না। কেননা, যাকে সবাই ভাল লোক বলে জানে ও খুব সম্মান করে, তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁকে কাবু করা বড় সহজ নয়। রাজার দু'দিক থেকে বিপদ উপস্থিত হ'তে পারে। এক ভিতর দিক থেকে—অর্থাৎ তার প্রজাদের দিক থেকে—আর এক বাহিরের দিক থেকে—বহিঃশত্রুর আক্রমণের ফলে। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে চাই উপযুক্ত সামরিক শক্তি—আর সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ বিশ্বাসী বন্ধু। প্রচুর সামরিক শক্তি থাকলেই আবার ভাল বন্ধু সহজে জোটে। এবং বাহিরের দিক থেকে যদি কোনো গণ্ডগোলের সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে ভিতরের দিকেও সব ঠাণ্ডা থাকে, যদি না আগে থেকেই গুপ্ত ষড়যন্ত্রের হাঙ্গামা চলতে থাকে। এমন কি বাহিরের দিকে কোনো অশান্তির কারণ ঘটলেও, তাঁর ভয় পাবার কিছু নেই—তিনি অনায়াসেই শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেন, যতক্ষণ তিনি নিজে

না হতাশ হয়ে পড়েন এবং পূর্ব্বে যা বলা হয়েছে, যদি তেমনি ভাবে সমস্ত আয়োজন পূর্ণ করে রেখে থাকেন ও অন্যান্য বিষয় তাঁর যেমন চলা উচিত যদি তেমন ভাবে চলে থাকেন। এ বিষয়ে স্পার্টান বীর নাবিসই উত্তম দৃষ্টান্ত। তাঁর কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে।

কিন্তু প্রজাদের সম্বন্ধে একমাত্র ভয়ের কথা এই যে, বাহির থেকে যখন বিপদ আসে, তখন তারা ভিতরে ভিতরে গোপনে ষড়যন্ত্র করতে পারে। এর প্রতিকার যে কি তা পূর্ব্বেই সবিস্তারে বলা হয়েছে। তিনি যদি এমন ভাবে চলেন, যাতে প্রজারা তাঁর প্রতি খুসী থাকে—তাদের ঘৃণা বা অবজ্ঞার পাত্র হওয়ার কারণ না ঘটে, তবে আর তাঁর ভয়ের হেতু নেই। ষড়যন্ত্রের সব চেয়ে বড় প্রতিকার ও প্রতিষেধক হচ্ছে এমন ভাবে চলা যাতে রাজা জনসাধারণের ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র হয়ে না পড়েন। যে ষড়যন্ত্র করে, সে আশা করে যে, তার কাজের ফলে যদি রাজাকে সরানো যায়, তবে জনসাধারণ খুসী হবে। কিন্তু সে যদি দেখে যে, লোকে তাতে খুসী না হয়ে তার উপরে আরো চটে যায় তবে আর সে তেমন কাজে হাত দিতে সাহস করবে না। কেননা ষড়যন্ত্র করাটাও বড় সুখের কাজ নয়—অসুবিধা ও ঝঞ্চাটেরও তাতে অন্ত নেই। আমাদের অভিজ্ঞতাই বলে যে ষড়যন্ত্রের ঘটনা হয়েছে বহু, কিন্তু সফল হয়েছে মাত্র দু'চারটা। এই বিফলতার কারণ খুঁজতেও বহু দূর যেতে হয় না। যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, সে একা একা কিছুই করতে পারে না—আরো দু'চার জনের সাহায্য তার না নিলেই নয়। কিন্তু গোপন ষড়যন্ত্রের ভিতরে তো আর যাকে তাকে ডাকা চলে না? —এমন লোককে ডাকতে হয়, যাকে সে রাজসরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট বলে মনে করে। কিন্তু যাকেই তুমি বিশ্বাস করে মনের কথা বলবে, তার হাতে তৎক্ষণাৎ তুমি এমন এক অস্ত্র দিলে যার জোরে সে তার

নিজের স্বার্থ অনায়াসে সাধন করতে পারে। কেননা, ইচ্ছা করলেই তোমার গোপন মতলব সব ফাঁস করে দিয়ে সে অশেষ প্রকারে নিজের সুবিধা করে নিতে পারে। কিন্তু সে ইচ্ছা সে করবেই বা না কেন ?—বিশেষতঃ যখন দেখে যে, বলে দিলে তার লাভ সুনিশ্চিত,—অপর দিকে ষড়যন্ত্রের সফলতা নিতান্তই অনিশ্চিত ও তা নানা বিপদসঙ্কুল। এরূপ অবস্থায়ও যদি সে বিশ্বাসঘাতকতা না করে, তবে বুঝতে হবে, হয় সে তোমার অতি অসাধারণ বন্ধু, নয়তো রাজার অতি অসাধারণ দুর্নিবার শত্রু।

অল্প কথায় বলতে হলে বলা যায় যে, ষড়যন্ত্রকারীর সম্বল বিশেষ কিছুই নেই—শুধু ধরা পড়ার আশঙ্কা, ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষ ও শাস্তির ভয় সব সময়ে তাকে ক্লিষ্ট ও উদ্ব্যস্ত করে রাখে। অপর পক্ষে রাজার দিকে রয়েছে, তার রাজ-বিভূতি, আইনের জোর, বন্ধুর সহায়তা ও রাষ্ট্রের শক্তি। আর সঙ্গে সঙ্গে যদি জনসাধারণও রাজার প্রতি খুসী থাকে তবে আর ষড়যন্ত্র করার দুর্বুদ্ধি যে কারো মাথায় গজাতে পারে এমন সম্ভাবনা দেখিনে। একে তো সব ষড়যন্ত্রকারীকেই তার মতলব কার্য্যে পরিণত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। এই ক্ষেত্রে আবার, কাজ হাসিল হওয়ার পরেও নিশ্চিন্ত হওয়ার জো নেই। কেননা জনপ্রিয় রাজার ক্ষতি করার দরুণ জনসাধারণই তার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে এবং জনসাধারণের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া একান্তই সুদূর-পরাহত।

এ বিষয় অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। আমি শুধু একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করবো। তা' বড় বেশী দিনের কথা নয়—আমাদের পিতা ও পিতৃ-স্থানীদের মনে থাকবার কথা। আনিবালে বেণ্টিভোগলি (Annibale Bentivogli) বোলোগ্‌নার (Bologna) রাজা

ছিলেন বর্ত্তমান রাজার পিতামহ। কানেস্‌চিরা (Canneschi) ষড়যন্ত্র করে তাকে হত্যা করেছিল। এক জিয়োভানি (Giovanni) ছাড়া তার পরিবারের কেউ রক্ষা পায়নি। জিয়োভানিও ছিলেন তখন নিতান্ত শিশু। কিন্তু এই হত্যার অব্যবহিত পরেই জনসাধারণ ক্ষেপে গিয়ে কানেস্‌চিদের ঝাড়ে-মূলে নিপাত করে ফেললো। এর একমাত্র কারণই হচ্ছে যে, বেণ্টিভোগলি বংশ তখন দেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। তার ফলে যখন বোলোগ্‌নাবাসীরা খবর পেলে যে এই বংশের এক ব্যক্তি লৌহকারের পুত্র বলে পরিচয় দিয়ে তখনো ফ্লোরেন্সে বেঁচে আছে, তৎক্ষণাৎ তারা তাঁকে ডেকে এনে রাজসিংহাসনে বসিয়ে দিল। যে পর্য্যন্ত না জিয়োভানি সাবালক হয়েছে, সে পর্য্যন্ত সে-ই তাদের উপর নির্ব্বিবাদে রাজত্ব চালিয়েছিল।

তাই যতক্ষণ রাজার উপরে প্রজার শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকে, ততক্ষণ আমি ষড়যন্ত্রের জন্য ভাবনার কোন কারণ দেখিনে। কিন্তু যখন প্রজারা তাঁর শত্রু হয়ে ওঠে ও তাঁর প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে থাকে, তখন তাঁর যে কোনো কিছু বা যে কোনো ব্যক্তি থেকেই ভয়ের কারণ উপস্থিত হ'তে পারে—কারো উপরেই আর তাঁর নির্ভর করা চলে না। অতএব যে কোনো বুদ্ধিমান রাজা ও সুশাসিত রাষ্ট্রের পক্ষে এমন ব্যবস্থা করা দরকার, যাতে প্রজারা অত্যাচারে মরিয়া হয়ে না ওঠে—যাতে তারা সুখে স্বচ্ছন্দে সন্তুষ্ট মনে বসবাস করতে পারে। এরূপ যে কি করে সম্ভব হোতে পারে, তাই হচ্ছে রাজার সবচেয়ে বেশী করে ভাববার ও করবার।

বর্ত্তমানে ফ্রান্স হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা সুশাসিত ও সু-সংঘবদ্ধ রাষ্ট্র। সেখানে এমন কতগুলি প্রতিষ্ঠান আছে, যার ফলে রাজার নিজের অবকাশও বেশী মেলে এবং হঠাৎ বিপদের আশঙ্কারও কারণ

থাকে না। তার মধ্যে একটা হচ্ছে প্রতিনিধি সভা বা পার্লামেণ্ট। এদের হাতে খানিকটা ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে রাজা অনেক ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারেন। যিনি কোন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তিনিই জানেন যে অভিজাত সম্প্রদায় কতখানি উচ্চাকাঙ্ক্ষাপরায়ণ এবং সেজন্যে তারা কতটা মরিয়া হয়ে উঠতে পারে। তাই তাদের ঠাণ্ডা রাখতে হলে, তাদের মুখের সামনে এক টুক্‌রা লোভের বস্তু ধরতে হয়। অপর দিকে আবার সাধারণ লোকেরা সর্ব্বদা অভিজাত সম্প্রদায়ের ভয়ে ভীত এবং তাই তাদের প্রতি সাধারণ লোকের বিরাগের অন্ত নেই। এরূপ অবস্থায় রাজার পক্ষে সাধারণ লোকদের রক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু তিনি যদি সাধারণ লোকের বেশী পক্ষপাতী হয়ে ওঠেন, তবে অভিজাত সম্প্রদায় হবে অসন্তুষ্ট। আবার অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর বেশী পক্ষপাতিত্ব দেখালে জনসাধারণ হবে অসন্তুষ্ট। এই উভয়-সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পেতে হ'লে, পার্লিয়ামেণ্ট রূপ এক মধ্যস্থ খাড়া করে দিলেই সব ল্যাঠা চুকে যায়। সেই মধ্যস্থের কাজ হবে বড়দের দাবিয়ে রেখে ছোটদের সুবিধা করে দেওয়া। তাতে কাজও ভাল হবে, অথচ যাদের ক্ষতি হবে, তারাও রাজাকে সেজন্যে দোষী করতে পারবে না। এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা বা বুদ্ধিমানের কাজ আর কিছু হতে পারে না। তা ছাড়া রাজ্যের নির্ব্বিঘ্নতার দিক দিয়েও এ ব্যবস্থা অতি চমৎকার। অতএব, যে কাজে দুর্নামের সম্ভাবনা আছে, তার ভার তিনি অন্যের হাতে দিবেন এবং যে কাজে সুনাম হ'তে পারে, সে কাজ নিজের হাতেই করবেন। তার পরে, আমি মনে করি, যে রাজার পক্ষে মোটামুটি অভিজাত সম্প্রদায়ের পক্ষপাতী হয়ে থাকাই উচিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাদের পক্ষপাতী হয়ে

এত দূর যাবেন না, যাতে তিনি সাধারণ লোকের ঘৃণার পাত্র হতে পারেন।

রোমান সম্রাটদের ইতিহাস আলোচনা করে কেউ হয়তো বলতে পারেন যে তাদের সম্বন্ধে আমার কথাগুলি খাটে না। কেননা এরূপ দেখা যায় যে তাদের মধ্যে অনেকেই সৎভাবে জীবন যাপন করেছেন এবং অন্যান্য অনেক গুণাবলীর পরিচয় দিয়েছেন—তবু কিন্তু তাদের রাজ্য স্থায়ী হয়নি—প্রজারা ষড়যন্ত্র করে কাউকে রাজ্যচ্যুত করেছে, কাউকে বা হত্যা করে ফেলেছে। কিন্তু তাদের ধ্বংসের কারণ সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখলেই বোঝা যাবে যে সেখানেও আমার কথাই খাটে। সম্রাটদের মধ্যে কয়েকজনের বৃত্তান্ত আলোচনা করলেই কথাটা পরিষ্কার হবে। তবে এখানে আমি শুধু সেই ঘটনাগুলিই উল্লেখ করবো, যার কিছু না কিছু বিশেষত্ব আছে।

আমার মনে হয়, দার্শনিক মার্কাস (Marcus) থেকে আরম্ভ করে মাকসিমিনাস (Maximinus) পর্যন্ত যারা সম্রাট হয়েছিলেন, তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা করলেই যথেষ্ট হবে। এই হিসেবে যে সব সম্রাটের কথা এই আলোচনায় উঠবে, তাঁদের নাম হচ্ছে—দার্শনিক মার্কাস, তার পুত্র কোমোডাস (Comodus), পার্তিনাক্স্ (Pertinax), সেভেরাস (Severus), তার পুত্র আণ্টোনিনাস (Antoninus), কারাকাল্লা (Caracalla), মাক্রিনাস (Macrinus), হেলিয়োগাবালাস (Heliogabalus), আলেকজেণ্ডার (Alexander) ও মাকসিমিনাস (Maximinus)।

প্রথমেই এই কথাটা খেয়াল রাখা দরকার যে অন্যান্য সাধারণ রাষ্ট্র থেকে রোমের অবস্থা ছিল কিছু স্বতন্ত্র। সাধারণতঃ যে কোনো রাষ্ট্রে রাজার যে অসুবিধার সঙ্গে লড়াই করতে হয়, তা হচ্ছে অভিজাত

সম্প্রদায়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও জনসাধারণের উদ্ধত অবাধ্যতাই। কিন্তু রোমান সম্রাটদের পক্ষে এ ছাড়া আর একটা ব্যাপার মহা সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তা হচ্ছে, তাদের আপন সৈন্যের অতি লোভজনিত নিষ্ঠুর অত্যাচার। এ এমন একটা বিষম ব্যাপার যে এর সমাধান করতে গিয়েই অনেকের সর্ব্বনাশ ঘনিয়ে এসেছিল। কেননা, একই সঙ্গে এরূপ সৈন্যকে ও জনসাধারণকে খুসী করা অত্যন্ত শক্ত কথা—কারো পক্ষেই তা সম্ভব বলে মনে হয় না। জনসাধারণ চায় শান্তি। তাই যে রাজার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই—নূতন নূতন রাজ্য জয়ের প্রবৃত্তি নেই, তাঁকেই তারা ভালবাসে। কিন্তু সৈন্যেরা ভালবাসে সেই রাজাকে বেশী, যিনি যুদ্ধ বিগ্রহের পক্ষপাতী—যিনি সাহসী, কঠোর প্রকৃতি ও লুণ্ঠন-প্রিয়। আর এই গুণগুলি রাজা যাতে জন-সাধারণের উপর প্রয়োগ করতে কুণ্ঠিত না হন, এইটেই তাদের প্রাণের একান্ত কামনা। কেননা, তাতে করে তারা বেতন পাবে দ্বিগুণ এবং তাদের লোভী ও নিষ্ঠুর প্রকৃতিটারও উপযুক্ত খোরাক জুটবে। তাই বংশের কারণেই হোক, কিম্বা শিক্ষার অসম্পূর্ণতার ফলেই হোক, যিনিই অন্যের উপরে আপন কর্ত্তৃত্ব ও প্রভুত্ব খাটাতে অক্ষম হয়েছেন, তিনিই সর্ব্বস্ব হারিয়ে ফতুর হয়েছেন। আর যাঁরা নূতন রাজা হয়ে 'শ্যাম রাখি কি কুল রাখি' অবস্থায় পড়ে, সৈন্যদের খুসী করতেই উৎসুক হয়েছেন, তাতে করে যে তাঁরা জন-সাধারণের ক্ষতি করছেন, সে দিকে খেয়াল রাখা আবশ্যক মনে করেন নি। এরূপ না করে অবশ্যি তাঁদের উপায়ও ছিল না। কারণ, এমন হোতেই পারে না যে সবাই রাজাকে ভালবাসবে—কেউ-ই তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে না। তবু তাঁরা প্রথমে তার জন্যেই চেষ্টা করে। কিন্তু যখন দেখে যে তা কিছুতেই সম্ভবপর করে

তোলা যায় না, তখন তাদের এক পক্ষকে অন্ততঃ খুসী রাখবার চেষ্টা করতে হয়, এবং এই দুই পক্ষের মধ্যে যার প্রতাপ ও শক্তি বেশী, তাকেই বেছে নেওয়া উচিত। তাই দেখা যায়, সম্রাটদের ভিতরে যারা অনভিজ্ঞ—নূতন রাজাসনের অধিকারী হয়েছেন, তাঁরা জনসাধারণের পক্ষ ছেড়ে, সহজেই সৈন্যদের একান্ত পক্ষপাতী হয়েছেন। তাতে কার সুবিধা হয়েছে কার হয়নি, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে, কে কতখানি সৈন্যদের উপর প্রভুত্ব রক্ষা করতে পেরেছে, তার উপরে।

সম্রাটদের মধ্যে মার্কাস, পার্তিনাক্স্ ও আলেকজেন্দার ছিলেন সহৃদয়, দয়ালু, ন্যায়নিষ্ঠ ও অত্যাচারের শত্রু—তারা সবাই নিতান্ত সাধারণ ও সাদাসিধা জীবন যাপন করতেন। কিন্তু যে সব কারণের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি, সেই কারণেই পার্তিনাক্স্ ও আলেকজেণ্ডার শেষ পর্য্যন্ত টিকতে পারেননি—দুঃখের ভিতর দিয়েই তাঁদের রাজত্বের অবসান হয়েছে। এক মার্কাসই যত দিন বেঁচে ছিলেন, সকলের ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্র হয়েই রয়ে গিয়েছিলেন। তার কারণ হচ্ছে, তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে রাজাসনের অধিকারী হয়েছিলেন—সে জন্যে তাঁকে জন-সাধারণের কিম্বা সৈন্যদের সাহায্য নিতে হয়নি। তার পরে, তিনি নানা সৎগুণেরও অধিকারী ছিলেন বলে সকলেরই সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন। তার ফলে তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, উভয় দলকেই তাদের আপন আপন অধিকারের ভিতরে সংযমিত করে রাখতে পেরেছেন এবং সে জন্যে তিনি কখনও অবজ্ঞা বা ঘৃণার পাত্রও হয়ে ওঠেন নি।

কিন্তু পার্তিনাক্স্ সৈন্যদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সৈন্যেরা ছিল উচ্ছৃঙ্খলভাবে যথেচ্ছ-জীবন-যাপনে

অভ্যস্ত, কোমোডাসের অবহেলার ফলে। কিন্তু পার্তিনাক্স্ চাইলেন, তারা যাতে সদ্‌ভাবে জীবন যাপন করে। তা তারা বরদাস্ত করতে পারবে কেন? ফলে তারা পার্তিনাক্স্ এর প্রতি একটা বিজাতীয় ঘৃণা পোষণ করতে লাগলেন। তার উপরে আবার তার বার্দ্ধক্যের জন্যেও তাকে তারা কৃপার চক্ষে—অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে লাগলো। এই জন্যে রাজত্ব করতে স্থরু করার অল্প দিনের ভিতরেই তিনি রাজ্যচ্যুত হয়েছিলেন। এখানে এই কথাটা বুঝতে হবে যে, রাজা মন্দ কাজের ফলে যেমন ঘৃণার পাত্র হ'তে পারেন, তেমনি ভাল কাজেও হ'তে পারেন। তাই আমি পূর্ব্বেও বলেছি যে রাজাকে অনেক সময়ে তার রাজত্ব রক্ষার জন্যেই মন্দ কাজ করতে বাধ্য হ'তে হয়। কারণ নেহাৎ আত্ম-রক্ষার জন্যেই যাদের উপর তোমার নির্ভর করতে হয়—তারা জনসাধারণই হ'ক, অভিজাত সম্প্রদায়ই হ'ক, আর সৈন্যই হ'ক—তারা যদি হয় দুশ্চরিত্র, দুঃশীল, তবে তাদের খুসী রাখবার জন্যে তাদের দুষ্কর্ম্মেও কতকটা সায় না দিলে তোমার চলবে না। সে অবস্থায়ও যদি তুমি, যা ভাল, সৎ, ন্যায়ানুমোদিত, তাই করতে উদ্যত হও, তবে তাতে তোমার ক্ষতি অনিবার্য্য।

তারপরে আলেকজেণ্ডারের কথা। আলেকজেণ্ডার অতিশয় ভাল মানুষ ছিলেন। সবাই তার প্রশংসা করতো। যে কারণে তাঁর এত প্রশংসা, তার মধ্যে একটা হচ্ছে এই যে, তাঁর চতুর্দ্দশবর্ষব্যাপী রাজত্বের ভিতরে কাউকে বিনা বিচারে হত্যা করা হয়নি। কিন্তু তা সত্বেও লোকে তাঁকে মেয়েলি স্বভাবসম্পন্ন, দুর্ব্বল বলে মনে করতো। সবাই এই বলে তাঁকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখতে লাগলো যে, তিনি নিজে রাজ্য শাসন করতে পারেন না—সব কিছুতেই মায়ের কথা শুনে মায়ের হুকুম মত

চলেন। ফলে, সৈন্যেরা তার বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে একদিন খুন করে ফেললে।

কিন্তু কোমোডাস, সেভেরাস্, আণ্টোনিনাস্, কারাকাল্লা ও মাক্সিমিনাস—এঁরা সবাই ছিলেন নিষ্ঠুর-প্রকৃতি ও লুণ্ঠন-প্রিয় লোক। সৈন্যদের খুসী রাখতে জনসাধারণের উপরে এমন অত্যাচার নেই, যা করেন নি, কিম্বা করতে দ্বিধা বোধ করেছেন। তার ফলে, সেভেরাস ছাড়া, আর সকলেরই পরিণাম অতিশয় বিষময় হয়েছিল। সেভেরাসের নিজের বল-বীর্য্য এতই বেশী ছিল যে, সৈন্যেরা তো সর্ব্বদা তাঁর অনুগত হয়ে ছিলই,—জন-সাধারণও, অশেষ অত্যাচার সত্ত্বেও, তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস করেনি। তাই তিনি শেষ পর্য্যন্ত সব ব্যাপারে জয়ী হয়েই গিয়েছেন। তার অদ্ভুত বীরত্ব লোকের কাছে একটা বিস্ময়ের বস্তু ছিল। সৈন্যদের তো ভয় ও বিস্ময়ের অন্ত ছিল না—জনসাধারণও সম্ভ্রমে মাথা নোয়াতো ও খুসী মনেই তাঁর শাসন মেনে চলতো। নূতন রাজা হয়েও সেভেরাস যে ভাবে চলেছিলেন ও কাজকর্ম্মের যেরূপ ব্যবস্থা করেছেন, তা অতি চমৎকার। তাই তার সম্বন্ধে আরো খানিকটা আলোচনা করতে চাই। সংক্ষেপে দেখাতে চাই যে, আবশ্যক মত কি করে কখনো শৃগাল-বৃত্তি, কখনো বা সিংহ-বৃত্তি অবলম্বন করতে হয়—যা করা সব রাজার পক্ষেই একান্ত আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলেছি—তা তিনি ভাল করেই জানতেন।

সম্রাট জুলিয়ান্ (Julian) ছিলেন নেহাৎ কুঁড়ে ও ঢিলা-ঢালা মানুষ। তাই দেখে সেভেরাস হঠাৎ অতর্কিতে সৈন্য নিয়ে রোমে গিয়ে উপস্থিত হবার মতলব আঁটলেন। তিনি তখন ছিলেন স্ক্লাভোনিয়াতে (Sclavonia) একদল সৈন্যের অধিনায়ক। সৈন্যদের তিনি এই বলে বুঝালেন যে ‘প্রিটোরিয়ান সৈন্যেরা যে সম্রাট

পার্তিনাক্স্‌কে হত্যা করেছিল, তার প্রতিশোধ নেওয়া উচিত এবং এই তার উপযুক্ত সময়'। এই অজুহাতে তিনি সৈন্য নিয়ে রোম অভিমুখে যাত্রা করলেন—ঘুণাক্ষরেও কাউকে জানতে দিলেন না যে, রাজাসনের প্রতি তার কোন লোভ আছে কিনা। সব ব্যবস্থা তিনি এমন গোপনে সমাধা করেছিলেন যে, ইতালীতে পৌছাবার পূর্ব্বে কেউ জানতেই পারেনি, তিনি কখন রওনা হয়েছেন। তিনি যখন নির্ব্বিবাদে রোমে এসে উপস্থিত হলেন, তখন সেনেট সভা ভয়ে তাঁকেই সম্রাট মনোনীত করলে ও জুলিয়ানকে মেরে ফেললে।

এর পরে সমগ্র সাম্রাজ্যে হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা হ'তে সেভেরাসের পক্ষে মাত্র দুটো প্রতিবন্ধক রইলো। এক হল নিগার (Niger), যিনি পূর্ব্বদেশে এসিয়ার সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিলেন। তিনি এসিয়াতে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। আর হল আলবিনাস (Albinus)। তিনি তখন সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশের শাসন কর্ত্তা ছিলেন ও নিজে সম্রাট হবার আকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ করছিলেন। সেভেরাস দেখলেন যে একই সময়ে উভয়ের সঙ্গেই শত্রুতা বাঁধানো বড়ই বিপদ-জনক। তাই তিনি স্থির করলেন যে, আলবিনাসকে সম্প্রতি স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে রাখবেন ও নিগারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। তিনি আলবিনাসকে লিখলেন যে সেনেট তাঁকে সম্রাট পদে মনোনীত করেছে। তবে তাঁর ইচ্ছা যে, এই সম্মান তিনি আলবিনাসের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করেন। তাই তিনি তাঁকে সীজার উপাধিতে বিভূষিত করতে চান। তিনি আরো লিখলেন যে, সেনেট সভাও আলবিনাসকে তাঁর সহযোগী বলে নির্দ্দেশ করেছে। আলবিনাসও এসব কথা একান্ত সত্য বলেই মেনে নিয়েছিলেন। তারপরে সেভেরাস যুদ্ধে নিগারকে পরাজিত ও নিহত করে ও পূর্ব্ব

দেশের সমস্ত বিলি-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে রোমে ফিরে এলেন। তখন তিনি সেনেটের কাছে নালিশ জানালেন যে, আলবিনাস তাঁর দ্বারা অশেষভাবে উপকৃত হয়েও তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছেন ও বিশ্বাস-ঘাতকতা করে তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করেছেন—অতএব তাঁর এই অকৃতজ্ঞতার শাস্তি হওয়া উচিত। এর পরে সেভেরাস ফরাসী দেশে গিয়ে তাঁকে ধরলেন ও মেরে ফেললেন। সেভেরাসের কার্য্য-কলাপ আলোচনা করে বোঝা যায়, তিনি লোকটি ছিলেন একাধারে সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী এবং শৃগালের ন্যায় ধূর্ত্ত। এরূপ লোককে সবাই ভয় ও সম্মানের চোখে দেখে—সৈন্যেরাও কখনো তার বিরুদ্ধে ঘৃণা পোষণ করবার সুযোগ পায় না। কাজেই সেভেরাস নূতন রাজা হয়েও সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র তাঁর অখণ্ড প্রতাপ অক্ষুন্ন রেখেছিলেন, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। তাঁর জুলুম ও অত্যাচারের ফলে যে লোকের ঘৃণার পাত্র হয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল, তাঁর বিরাট কীর্ত্তি ও সুনামই তাঁকে তা থেকে রক্ষা করেছে।

সেভেরাসের পুত্র আন্টোনিনাস (Antoninus) অতি উচ্চদরের লোক ছিলেন। এত সব সদ্‌গুণ তাঁর ছিল, যে তার তুলনা নেই। ফলে সকলেই তাঁকে সম্মানের চোখে দেখতো এবং সৈন্যেরা খুসী মনে তাঁর শাসন ও কর্ত্তৃত্ব মেনে নিয়েছিল। তিনি সাতিশয় যুদ্ধ-প্রিয় ছিলেন—দুঃখ-কষ্ট সইবার ক্ষমতা ছিল তাঁর অতি অদ্ভুত রকমের—সুখাদ্য ও অন্যান্য বিলাস-ব্যসন তিনি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন। এই সব কারণে সৈন্যেরা তাঁর অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু তাঁর নিষ্ঠুর অত্যাচার ও অকুণ্ঠ হিংস্রতার সীমা পরিসীমা ছিল না—তা এতই অশ্রুতপূর্ব্ব ও অনন্যসাধারণ যে, এক এক করে অসংখ্য লোককে হত্যা করেও তাঁর রক্ত-পিপাসা তৃপ্ত হ'লো না। এর পরেও তিনি আবার

রোম ও আলেকজেন্দ্রিয়ার বহুসংখ্যক অধিবাসীকে মেরে ফেলবার আদেশ দিলেন এবং তা কার্য্যে পরিণতও হোলো। এই সব কারণে বিশ্বশুদ্ধ লোকই তাঁর প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে আরম্ভ করলো এবং যারা তাঁর চারদিকে সঙ্গী হিসেবে থাকতো, তারাও তাঁকে যমের মত ভয় করতো। ফলে আপন সৈন্য-বাহিনীদ্বারা পরিবেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও এক শতাধ্যক্ষের অর্থাৎ শত সৈনিকের অধিনায়কের হাতে তিনি নিহত হলেন। এ থেকে একথাই বুঝতে হবে যে, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, বেপরোয়া, দুঃসাহসী লোকের হাতে এরূপ অভাবনীয় আকস্মিক মৃত্যু যে কোনো রাজার পক্ষে যে কোনো সময়েই ঘটতে পারে—একে সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলা কখনই সম্ভবপর নয়। কেননা, যার আপন প্রাণের মায়া নেই, তার পক্ষে এরূপ কাজ কিছুই নয়। কিন্তু এরূপ ঘটনা ঘটে খুব কমই। কাজেই এজন্য রাজার খুব একটা ভয়ে ভয়ে থাকার কিছু নেই। শুধু একটা বিষয়ে তাঁর খুব সাবধান থাকা উচিত। তা হচ্ছে, যারা তাঁর চারদিকে থাকে, তাদের মধ্যে কিম্বা রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত অন্যান্য কর্ম্মচারীদের মধ্যে এমন কোন লোক না থাকে, যার গুরুতর অনিষ্ট সে সাধন করেছে। মোটের উপরে কর্ম্মচারীদের সন্তুষ্ট রাখা দরকার—তাদের কারো যাতে বিষম ক্ষতি হয়, এমন কাজ সর্ব্বদা এড়িয়ে চলা উচিত। আণ্টোনিনাস এ বিষয়ে সাবধান হয়ে চলেন নি। যে সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁকে খুন করেছে, তার ভাইকে তিনি নৃশংসভাবে হত্যা করেছেন এবং তাঁকেও প্রায় প্রত্যহই শাসাচ্ছিলেন, অথচ তাকেই তিনি নিজের শরীররক্ষী দলের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। এরূপ করা নিতান্তই দুঃসাহসের কাজ এবং তার বিষময় ফলও তাকে ভোগ করতে হয়েছে।

তারপরে কোমোডাসের কথা, তিনি ছিলেন সম্রাট মার্কাসের পুত্র।

উত্তরাধিকার-সূত্রেই তিনি সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন। এরূপ ক্ষেত্রে সমগ্র সাম্রাজ্যটার উপরেই তাঁর শাসনদণ্ড অক্ষুণ্ণ রাখা কিছুই শক্ত ব্যাপার ছিল না। তাঁর পিতার পথ অনুসরণ করে চললেই তিনি সৈন্য ও জনসাধারণকে খুসী রাখতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেন নি। তাঁর নিজের প্রকৃতিটা ছিল নিষ্ঠুর ও পাশবিকতা পূর্ণ। তিনি সৈন্যদের নানা রকমের ফূর্ত্তি ও আমোদ-প্রমোদে উৎসাহিত করে তাদের স্বভাবটাই বিগড়ে দিলেন ও তাদের দূষিত-চরিত্র করে তুললেন। মতলবটা এই, যাতে সৈন্যদের খুসী রেখে, তিনি সাধারণ লোকদের উপরে অত্যাচার ও অবাধ লুণ্ঠন চালাতে পারেন। তার পরে, তিনি নিজের পদ-মর্য্যাদা রক্ষা করে চলতেন না; সাধারণ মল্লক্ষেত্রে হয়তো নিজেই নেমে যেতেন সাধারণ মল্লদের সঙ্গে লড়তে। এছাড়াও তিনি আরো অনেক জঘন্য নীচ কাজে হাত দিতেন, যা কোন সম্রাটের পদ-মর্য্যাদার সঙ্গে খাপ খায় না। এই সব কারণেই সৈন্যেরাও তাঁর প্রতি মনে মনে অবজ্ঞা পোষণ করতে লাগলো। জন-সাধারণের তো তাঁর প্রতি ঘৃণার অবধিই ছিল না। ফলে চলতে লাগলো ষড়যন্ত্র ভিতরে ভিতরে, যার পরিসমাপ্তি হোলো তাঁর হত্যায়।

আর বাকী রইলো মাক্‌সিমিনাসের কথা। তিনি খুবই যুদ্ধপ্রিয় লোক ছিলেন। তাই সম্রাট আলেকজেণ্ডারের মেয়েলি মৃদুতা ও প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতায় ত্যক্ত-বিরক্ত হ'য়ে সৈন্যেরা তাঁকে হত্যা ক'রে মাক্‌সিমিনাসকে রাজতক্তে বসিয়েছিল। কিন্তু বেশীদিন তিনি এই পদ ও সম্মান রক্ষা করতে পারেন নি? দুই কারণে তিনি অল্প দিনেই সকলের ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র হয়ে পড়েছিলেন। এক হচ্ছে, তিনি থ্রেসে (Thrace) ভেড়ার কারবার চালাতেন। সবাই একথা

জানতো এবং সকলেই এ কাজ সম্রাটের অযোগ্য ও সম্মানহানিকর বলে মনে করতো। তাই সবাই এজন্য তাঁকে অবজ্ঞার চোখে দেখতে লাগলো। দ্বিতীয় হচ্ছে, সম্রাট মনোনীত হয়ে তিনি কোথায় রোমে এসে বসবেন ও রাজধানীতে আপন কর্ত্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা করবেন, তা না করে তিনি কেবলই দেরী করতে লাগলেন। তার উপরে আবার ভীষণ হিংস্র স্বভাবের লোক বলে তাঁর একটা দেশ-ব্যাপী অখ্যাতি ছিল। তার কারণ হচ্ছে, তিনি তাঁর কর্ম্মচারীদের দ্বারা রোমে ও সাম্রাজ্যের আরো অনেক স্থানে অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছিলেন। ফলে জগৎ শুদ্ধ লোকই একদিকে যেমন নীচবংশে জন্ম বলে তাঁর প্রতি একটা ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ পোষণ করতে লাগলো, তেমনি আবার তাঁর বর্ব্বরোচিত নিষ্ঠুরতার জন্যে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। প্রথমে আফ্রিকা বিদ্রোহের পতাকা তুললো, তারপরে সেনেট সভা, রোম ও ক্রমে সমগ্র ইতালীই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগলো। অবশেষে তাঁর নিজের সৈন্যেরা এই বিদ্রোহে যোগ দিল। মাক্‌সিমিনাস সৈন্যদের নিয়ে আকিলিয়া (Aquileia) অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু সে জায়গাটা অধিকার করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছিলো। সেখানেও তার নিষ্ঠুর অত্যাচারের বিরাম ছিল না। তার ফলে সৈন্যেরা গেল ক্ষেপে। তাছাড়া, চারদিকে সবাই তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে দেখে, সৈন্যদেরও ভয় গিয়েছিল ভেঙ্গে। তখন যা হবার, তাই হ'লো—সবাই মিলে তাঁকে বন্দী করে মেরে ফেললো।

সম্রাটদের মধ্যে হেলিয়োগাবালাস (Heliogabalus), মাক্রিনাস (Macrinus) ও জুলিয়ান (Julian) সম্বন্ধে আলোচনা অনাবশ্যক। তাঁরা সবাই ছিলেন নিতান্ত হেয় চরিত্রের লোক। তাই দুদিনেই তাঁদের

রাজত্বের অবসান হয়েছে। এই বিষয়ের আলোচনা শেষ করার পূর্ব্বে আমি একটা কথা বলতে চাই যে, আগের দিনে যা-ই হয়ে থাক, বর্ত্তমান কালে রাজাদের এ বিষয়ে অসুবিধা অনেক কম। সৈন্যদের খুসী রাখার জন্যে যে তাদের যা তা করতে দেওয়া, এখন আর তার কোনো প্রয়োজন নেই। অবশ্যি সময়ে সময়ে একটু আধটু প্রশ্রয় তাদের দিতেই হয়, তবে তা এমন কিছু মুস্কিলের ব্যাপার নয় এবং তাতে তেমন কোনো ক্ষতিও হয় না। সেকালের রোমক সাম্রাজ্যের সৈন্যবাহিনীতে এমন সব অভিজ্ঞ লোক থাকতো, যারা প্রাদেশিক শাসন কার্য্যে কিম্বা রাষ্ট্রের অন্যান্য বিভাগে কাজ করে চুল পাকিয়েছে, কিন্তু বর্ত্তমান কালে কোনো রাজার সৈন্যবাহিনীতেই এমন পুরোণো পাকা লোকের সন্ধান মেলে না। তা ছাড়া, সেই যুগে জন-সাধারণের চেয়েও সৈন্যদের খুসী রাখা রাজার আত্ম-রক্ষার পক্ষেই বেশী আবশ্যক ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান কালে জন-সাধারণই বেশী প্রতাপশালী—সৈন্যদের চেয়ে তাদের জোরটাই বেশী। তাই এখন সৈন্যদের চেয়েও জন-সাধারণকে খুসী রাখাই বেশী দরকার। এক তুর্ক ও সোলদানদের সম্বন্ধেই শুধু এ কথা খাটে না। এ ছাড়া আর সব রাজাদের সম্বন্ধেই এই কথা।

তুর্ক সম্রাট সম্বন্ধে ব্যাপার এই যে, সর্ব্বদার জন্য তাঁর হাতে ১২ হাজার পদাতিক ও ১৫ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য প্রস্তুত থাকে। তারাই সাম্রাজ্যের শক্তি এবং তাদের উপরেই সাম্রাজ্যের শান্তি ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে। এরূপ অবস্থায় জন-সাধারণের সুবিধা অসুবিধার কথা বাচ-বিচার না করে, সৈন্যদের খুসী রাখা একান্ত প্রয়োজন। সোলদানদের রাজ্য সম্বন্ধেও এই একই কথা। সেখানেও সৈন্যেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা—তাদের হাতেই রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত। কাজেই রাজার পক্ষে এক্ষেত্রেও জন-সাধারণের স্বার্থে আঘাত করেও সৈন্যদের বন্ধুত্ব

রক্ষা করা প্রয়োজন। সোলদানদের সম্বন্ধে আর একটা কথা লক্ষ্য করবার বিষয়, এই রাষ্ট্রটা একটু স্বতন্ত্র রকমের—অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে এর প্রকৃতিগত মিল নেই। এই রাষ্ট্রাধিপতির অবস্থা অনেকটা পোপের মত। এরূপ রাষ্ট্রকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত রাষ্ট্রও বলা চলে না এবং সম্পূর্ণ নব-স্থাপিত রাষ্ট্র বলাও ভুল। কেননা রাজার ছেলেরাই যে রাজা হবে, তার কোনো ঠিক নেই। কে রাজা হবে, তা ঠিক হয় নির্ব্বাচনের দ্বারা। যাদের হাতে নির্ব্বাচনের ক্ষমতা, তারা যাকে বরণ করে নেবে অধিকাংশের মতে, সেই রাজা হবে। পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার ছেলেরা শুধু অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবে। এই প্রথা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে বলে, এরূপ রাষ্ট্রকে নব-স্থাপিত রাষ্ট্রও বলা চলে না। কেননা, নব-স্থাপিত রাষ্ট্রে যে সব মুস্কিল এসে জোটে, এখানে তার কোনো বালাই নেই। রাজা নূতন হলেও, যে প্রথা অনুসারে তিনি নির্ব্বাচিত, তা বহুদিনের পুরোণো। ফলে, নির্ব্বাচিত হওয়ার পরে তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাজার মতই রাজত্ব করতে থাকেন।

এখন গোড়াকার আলোচ্য বিষয়ে ফেরা যাক। যে সকল সম্রাটের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করেছি, তা থেকে দেখতে পাই যে, ঘৃণা বা অবজ্ঞার পাত্র হওয়াই তাঁদের অনেকের সর্ব্বনাশের কারণ হয়েছে। আরো দেখতে পাই যে, এঁদের মধ্যে কয়েকজন এক ভাবে চলেছেন এবং বাকী সকলে আর এক ভাবে চলেছেন। কিন্তু উভয় দলের ভিতরেই এক এক জন শুধু ভালোয় ভালোয় কাটিয়ে গিয়েছেন এবং বাকী সকলেরই পরিণাম বিষময় হয়েছে। মার্কাস উত্তরাধিকারসূত্রে রাজাসনের মালিক হয়েছিলেন। কিন্তু পার্তিনাক্স্ ও আলেকজেণ্ডারের অবস্থা সেরূপ ছিল না।

তাঁদের মত নূতন রাজার পক্ষে মার্কাসের পন্থা অনুসরণ করতে যাওয়া নিরর্থক তো বটেই—বিপদের সম্ভাবনাও তাতে প্রচুর। সেইরূপ কারাকাল্লা, কোমোডাস্ ও মাক্‌সিমিনাস যদি সেভেরাসের পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা করতেন, তবে তার ফলেই তাঁদের বিনাশ অনিবার্য্য হয়ে উঠতো। কেননা, সেভেরাসের যে অপরিসীম সাহস-বীর্য্য ছিল, তা তাঁদের ছিল না। কাজেই তাঁর পথ তাঁর মত বীর্য্যশালী লোকের পক্ষেই সাজে—অন্যের পক্ষে তা অনধিকার চর্চ্চা। কাজেই যিনি নূতন রাজা হয়েছেন অর্থাৎ উত্তরাধিকারসূত্রে রাজা হন নি, তাঁর পক্ষে মার্কাসের কার্য্য-কলাপ অনুকরণ করতে যাওয়া সাজে না, কিম্বা সেভেরাসের পন্থা অনুসরণও একান্ত প্রয়োজন নয়। তবে কেমন করে নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হয়, সেভেরাসের দৃষ্টান্ত থেকে তাঁর সেই শিক্ষা নেওয়া উচিত এবং রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে কি ভাবে চললে, সুমহান গৌরবের অধিকারী হওয়া যায় ও রাজ্যে নিরাপদ শান্তি অটুট থাকে, সেই শিক্ষা নেওয়া উচিত মার্কাসের কার্য্যকলাপ থেকে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

দুর্গ-স্থাপন, নিরস্ত্রীকরণ ইত্যাদি ব্যবস্থার উপকারিতা ও অনিষ্টকারিতা

১। রাষ্ট্রের শাসন-শৃঙ্খলা সুদৃঢ় করে তুলবার জন্যে কোনো কোনো রাজা প্রজাদের সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত্র করেছেন। কেউ তাঁর রাজ্যের সহরগুলিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতরে দলাদলি রেষারেষি জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছেন। কেউ কেউ বিভিন্ন সহরের ভিতরে একটার সঙ্গে আর একটার শত্রুতা বাধাবার বা শত্রুতাটাকে ঘোরালো করে তুলবার প্রয়াস পেয়েছেন। কেউ কেউ রাজত্বের প্রথমে যাদের অবিশ্বাস করেছেন, পরে তাদের মন জয় করে নিজের পক্ষপাতী করে তুলবার চেষ্টা করেছেন। অপর কেউ কেউ দুর্গ-প্রাকার গড়ে তুলেছেন, কেউ কেউ বা দুর্গ-প্রাকার যা আছে, তা-ও ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছেন। এ সব সম্বন্ধে কি করা উচিত, তা রাজ্যের অবস্থা না জানলে সঠিক বলা চলে না। তথাপি সব রকমের অবস্থা বিবেচনা করে সাধারণভাবে যা বুঝি, বলবো।

২। যিনি উত্তরাধিকারসূত্রে রাজত্ব পাননি—অন্য কোনো কারণে নূতন রাজা হয়েছেন, এমন রাজা কখনো প্রজাদের নিরস্ত্র করেন নি। বরং যিনি রাজা হয়ে দেখেছেন যে প্রজারা নিরস্ত্র, তাদের তিনি সশস্ত্র

করে তোলবার চেষ্টা করেছেন। কারণ প্রজাদের সশস্ত্র করে তোলা মানেই রাজার অস্ত্রবল বাড়ানো। আর তার ফলে যারা বিশ্বাসের অযোগ্য ছিল, তারা বিশ্বাসী হ'য়ে ওঠে এবং যারা বিশ্বাসী ছিল, তাদের বিশ্বস্ততা চিরকাল অটুট থাকে। মোটের উপর সমস্ত প্রজাই রাজার বিশ্বাসী অনুচরস্বরূপ হ'য়ে দাঁড়ায়। এমন হ'তে পারে যে, সব প্রজাদের সশস্ত্র করে তোলা চলে না। সেরূপ ক্ষেত্রে যারা অস্ত্র রাখার অধিকার পেলো, তারা বিশেষভাবেই লাভবান হ'ল। যারা পেলোনা, তাদের সম্বন্ধেও তখন আর ভাবনার কিছু থাকে না—অনায়াসেই তাদের বশীভূত করে রাখা চলবে। ব্যবহারের এই পার্থক্যের যে অর্থ কি, তা লোকে সহজেই বুঝতে পারে। তার ফলে, যারা অস্ত্র পেলো, তারা রাজার একান্ত পক্ষপাতী ও তাঁর উপরেই নির্ভরশীল হ'য়ে থাকবে। যারা পেলো না, তারাও বুঝবে যে কাজ যারা বেশী করে, কিম্বা বিপদের ঝুঁকি যাদের বেশী, পুরস্কারের অংশটা তাদের ভাগে বেশী পড়াটাই স্বাভাবিক। তাই রাজার এই কাজটাকে তারা একটা অক্ষমনীয় অপরাধ বলে মনে করবেন না। কিন্তু অস্ত্র যাদের আছে, তাদের সে অস্ত্র কেড়ে নিলে তারা মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হবে—ভাববে তাদের তুমি ভীরু, কাপুরুষ মনে কর, কিম্বা অবিশ্বাসের চোখে দেখ বলেই তাদের অস্ত্র কেড়ে নিচ্ছো। তার ফলে সকলেই তোমার প্রতি একটা বিজাতীয় ঘৃণা পোষণ করতে সুরু করবে। কিন্তু তোমার তো রাজ্য রক্ষার জন্যে সৈন্য চাই। কাজেই দেশী লোকের হাতে যদি অস্ত্র দিতে না চাও, তোমাকে ভাড়াটে সৈন্য সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু ভাড়াটে সৈন্য যে কতটা কার্য্যকরী, তা আমরা সবাই জানি। তা ছাড়া, তোমার ভাগ্যগুণে যদি ভাড়াটে সৈন্য ভালও প্রমাণিত হয়, তবু তা শক্তিমান প্রতিপক্ষ ও অবিশ্বাসী প্রজার বিরুদ্ধে তোমায় রক্ষা করতে

পারবে না। তাই আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, কোন নূতন রাজাই নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের অধিপতি হ'য়ে, প্রথমেই প্রজাদের ভিতরে নূতন অস্ত্র-শস্ত্র বিতরণ করে তাদের সম্পূর্ণ সশস্ত্র ক'রে তুলেছেন—কখনো তাদের নিরস্ত্র করবার চেষ্টা করেন নি। ইতিহাসে এর দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কিন্তু যখন কোনো দেশের রাজা অপর কোনো দেশ জয় ক'রে, নিজের রাজ্য বৃদ্ধি করেন, তখন এই নূতন দেশের লোকদের নিরস্ত্র ক'রে রাখা একান্ত দরকার। কেবল যারা তাঁকে সেই দেশ জয়ে সাহায্য করেছে তাঁর পক্ষপাতী হ'য়ে, তাদের সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করা ঠিক হবে না —তাদের হাতে যে অস্ত্র-শস্ত্র আছে, তা তাদের রাখতে দেওয়াই উচিত। কিন্তু তারাও যাতে কালক্রমে স্ত্রীজনসুলভ দুর্ব্বলতাগ্রস্ত ও মৃদু স্বভাবাপন্ন হ'য়ে পড়ে, সে পক্ষে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করা উচিত। ক্রমে ব্যবস্থা করে অবস্থাটা এমন করে তুলতে হবে, যাতে অস্ত্রধারী পুরুষ সবই তোমার আপন দেশের অধিবাসী হয়।

৩। আমাদের বাপ দাদারা ও অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্তিরাও বলতেন যে পিষ্টোয়িয়া (Pistoia) শাসন করতে ভেদনীতি অবলম্বন করা ও পিসাকে দখলে রাখতে হলে দুর্গ-প্রাকার গড়ে তোলা দরকার। এই ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে তাঁরা অনেক সময়ে তাদের শাসনাধীন সহর গুলিতে দলাদলি জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পুরাকালে এ নীতি যতই কার্য্যকরী হয়ে থাক না, বর্ত্তমান যুগের পক্ষে একে আদর্শ নীতি বলে গ্রহণ করা চলে না। সেকালে ইস্তালীর শক্তিবৃন্দের ভিতরে এমন একটা যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল, যে সব সময়ে তাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ও সমতা রক্ষিত হ'তো। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নেই। তাই বর্ত্তমান কালে এ নীতি কার্য্যকরী হবে বলেও আমার বিশ্বাস হয় না। বরং এই কথাই জোর করে বলা চলে যে, এরূপ

দলাদলি ও বিবাদ-বিসম্বাদ-প্রপীড়িত দেশ শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হ'লে, তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে উঠবে। কেননা সে ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণবল দল শত্রুপক্ষে নিশ্চয়ই যোগ দেবে। তখন এই মিলিত শক্তিকে ঠেকিয়ে রাখা অপর দলের শক্তিতে কুলিয়ে উঠবে না। আমার বিশ্বাস, এই ধারণার বশেই ভেনেসিয়ানরা তাদের শাসনাধীন সহরগুলিতে গুয়েল্‌ফ্‌ ও ঘিবেলিন্‌ (Guelph and Ghibelline) দলের ঝগড়া-ঝাটি উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। তাদের রক্তপাতের পর্য্যন্ত পৌছতে দেয়নি বটে, শুধু তারা এই ঝগড়াটাকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করতো। মতলবটা ছিল এই যে, তারা যাতে এই ঝগড়া-ঝাটি নিয়ে সর্ব্বদা ব্যস্ত থেকে ভেনেসিয়ানদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হ'তে না পারে। কিন্তু আমরা এখন জানি যে তাদের সে আশা পূর্ণ হয়নি। যেহেতু ভাইলা (Viala) যুদ্ধে পরাজয় হ'লে পরে উক্ত উভয় দলের মধ্যে একদল যে সাহস করে দেশের শাসন-দণ্ড হস্তগত করেছিল, তা কে না জানে। কাজেই এরূপ নীতি যে রাজার দুর্ব্বলতাই বাড়িয়ে তুলবে, তাতে সন্দেহ নেই। কোনো সজীব সতেজ রাষ্ট্রে এরূপ দলাদলি চলতে দেওয়া যেতেই পারেনা। এরূপ ভেদ-নীতির অনুসরণ শান্তির সময়ে চলতে পারে। কিন্তু যুদ্ধ বাধলেই এ নীতির অনুপযোগিতা ও অনিষ্টকারিতা সহজেই ধরা পড়ে।

৪। বাধা-বিপত্তি জয় ক'রেই যে রাজারা বড় হন, তাতে সন্দেহ নেই। ভাগ্যও তাঁদের অনুকূল, অনেক সময় দেখা যায়। বিশেষতঃ যে নূতন রাজাকে তাঁর ভাগ্য-লক্ষ্মী বড় করে তুলতে চায়, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী শত্রু দাঁড় করিয়ে তাঁকে বিপদের সম্মুখীন করে দেয়, যাতে তিনি সেই শত্রুর শক্তিকে জয় ক'রে মহত্তর গৌরবের অধিকারী হ'তে পারেন। এ যেন শত্রুই তাঁর জন্যে উন্নতির সোপান তৈয়ের করে

দেয়। যিনি উত্তরাধিকারসূত্রে রাজাসনের মালিক হন, তাঁর পক্ষে এরূপ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী না থাক্‌লেও, যিনি নূতন রাজা হয়েছেন, তাঁর পক্ষে অত্যন্ত দরকারী। এই কারণে অনেকে মনে করেন যে,সুবিধা মত কৌশল করে নিজের বিরুদ্ধে খানিকটা শত্রুতা ও বিরুদ্ধতা উদ্বুদ্ধ করে তোলা ভাল। বুদ্ধিমান ব্যক্তি এরূপ ব্যবস্থাই ক'রে থাকেন। তার ফলে এই শত্রুতা জয় ক'রে তিনি অধিকতর সম্মানের অধিকারী হ'তে পারেন।

৫। এরূপ দেখা যায় যে, প্রথমে যাদের অবিশ্বাস করা হয়, পরে তারাই বেশী বিশ্বাসী হয় ও বেশী কাজে আসে। অন্যের পক্ষে যাই হোক, অন্ততঃ নূতন রাজার অভিজ্ঞতা থেকে এই কথাটাই প্রমাণিত হয়। সিয়েনা রাজ (Prince of Siena) পাণ্ডোল ফো পেট্রুসির (Pandol fo Petrucci) দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যায় যে, তিনি প্রথমে যাদের বিশ্বাস করেছেন, তাদের চেয়ে যাদের প্রথমে বিশ্বাস করেন নি, দেশশাসন ব্যাপারে তাদেরই সাহায্য নিয়েছেন বেশী। এসব ব্যাপারে সর্ব্বত্র গ্রাহ্য অভ্রান্ত সত্য হিসেবে কিছুই বলা চলেনা। কেননা, যা-ই বলা যাবে, জনে জনে ও অবস্থাবিশেষে তার ব্যতিক্রম হতে বাধ্য। মোটের উপরে এই একটা কথা বলা যায় যে, কোনো রাজত্বের প্রথমে যারা বিরুদ্ধে ছিল, তারা যদি এমন দুরবস্থাপন্ন লোক হয় যে রাজার সাহায্য না হলে তাদের চলে না, তবে সহজেই তাদের মন জয় করে রাজা তাদের নিজের পক্ষপাতী করে তুলতে পারবেন। তারা নিজের গরজেই ভাল কাজ ক'রে তোমার মনের বিরুদ্ধ ভাবটা দূর করে দেবার চেষ্টা করবে। তাই তারা একান্ত বিশ্বাসী হ'য়ে তোমার কাজ করে দেবে ও তোমার বিশেষ অনুরাগী ভক্ত হ'য়ে উঠবে। যারা তোমার বিশ্বাসী ছিল—তোমাকে ভয় করে চলা যাদের

পক্ষে একান্তই অনাবশ্যক, তারা কাজে অবহেলা করতেও পারে। তাই যাদের তুমি প্রথমে বিশ্বাস করনি, তাদের কাছ থেকেই কাজ পাবে বেশী। যখন কোনো ব্যক্তি কতকগুলি লোকের সঙ্গে মিলে ষড়যন্ত্র করে ও তাদের পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে কোনো দেশ হস্তগত করে, তখন তার বিশেষ করে ভেবে দেখা দরকার যে, যারা তার সাহায্য করেছে, তারা কেন করেছে—কি তাদের মতলব। বিষয়টা খুবই গুরুতর। তাই আমি তাদের এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে সাবধান ক'রে দিতে চাই। যদি তোমার প্রতি একটা স্বাভাবিক টান ও প্রীতি-বন্ধনের বশেই তোমায় সাহায্য না ক'রে থাকে—তাদের গভর্ণমেণ্টের প্রতি অসন্তোষই যদি একমাত্র কারণ হয়, তবে বেশীদিন তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা সম্ভব হবে না। কেননা, তাদের জন্যে তুমি যা-ই কর না কেন, তাদের কখনো তুমি সন্তুষ্ট করতে পারবে না। প্রাচীন ও বর্ত্তমান ইতিহাসে এ বিষয়ের দৃষ্টান্তের অভাব নেই। সে সব দৃষ্টান্ত আলোচনা ক'রে আমরা দেখতে পাই যে, যে কোনো রাজার পক্ষে সেই সব লোকের সঙ্গেই বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলা সহজ, যারা পূর্ব্ববর্ত্তী গভর্ণমেণ্টেরই পক্ষপাতী ছিল এবং সেই জন্যেই বর্ত্তমান রাজার শত্রুপক্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু যারা তাদের গভর্ণমেণ্টের প্রতি অসন্তুষ্ট হ'য়ে তোমার পক্ষপাতী হয়েছিল ও তোমায় উৎসাহ দিয়েছিল সে দেশ অধিকার করতে, তাদের সঙ্গে বন্ধুতা রক্ষা করা কিছুতেই তেমন সহজ হবে না।

৬। কোনো দেশ অধিকার করে রাজারা দুর্গ-প্রাকার নির্ম্মাণ করে সে দেশ সুরক্ষিত করে তুললেন। তাঁদের ভিতরে এ-টা যেন একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁরা মনে করতেন যে, লাগাম পরিয়ে যেমন ঘোড়া বেঁধে রাখা ও সংযত করা চলে, সেরূপ, যারা তাঁদের বিরুদ্ধে

ষড়যন্ত্র করার মতলব পোষণ করে, দুর্গ-পরিখাদ্বারা তাদেরও দাবিয়ে রাখা সম্ভবপর হবে। তা ছাড়া শত্রুর আক্রমণের প্রথম অবস্থায় প্রতিবন্ধক হিসেবে এগুলি কার্যাকরী হবে বলে তারা মনে করতেন। আমি এ প্রথার নিন্দে করিনে, কেননা আগের দিনে এ প্রথা সত্যিই যথেষ্ট কার্য্যকরী ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এমনও তো দেখতে পাই যে, বর্ত্তমান যুগে কেউ কেউ নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ না করে, বরং যা ছিল, তাও ভেঙ্গে ফেলেছেন। যেমন, মেসার নিকোলো ভিটেলি (Messer Nicolo Vitelli) সিটা ডি কাষ্টেলো (Cita de Castello) অধিকার করে, সেখানকার দু' দুটো দুর্গ ভেঙ্গে ফেলেছেন এবং তা করেছেন, সে দেশে তার শাসন নিরাপদ করার জন্যেই। উরবিনোর (Urbino) ডিউক গুইডো উবালডো (Guido Ubaldo) নিজের রাজ্য থেকে সিজারী বর্জ্জিয়া কর্ত্তৃক বিতাড়িত হয়েছিলেন। পরে যখন তিনি ফিরে এলেন, প্রথমেই দেশের যাবতীয় দুর্গ ভূমিসাৎ করে দিলেন। যে হেতু তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল যে, দুর্গগুলি না থাকলেই দেশ রক্ষার পক্ষে সুবিধা হবে। বেনটিভোগলিও (Bentivogli) বোলোগ্‌নাতে ফিরে এসে সব দিক বিবেচনা করে এরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। কাজেই দুর্গ-প্রাকার কার্য্যকরী হবে, কি হবে না, তা নির্ভর করে বিশেষ অবস্থার উপরে। একদিক দিয়ে তাতে সুবিধা হোলেও, আর এক দিক দিয়ে তা অসুবিধার কারণ হোতে পারে। মোটামুটি এই প্রশ্নের বিচার এই ভাবে করা যায়। যিনি মনে করেন যে বহিঃশত্রু থেকে তার ততটা বিপদের আশঙ্কা নেই, যতটা আছে প্রজাদের দিক থেকে, তার পক্ষে দুর্গ-প্রাকারের প্রয়োজন আছে। কিন্তু যার বিপদের আশঙ্কা প্রজাদের থেকে ততটা নেই, যতটা আছে বহিঃশত্রু থেকে, তার দুর্গ নির্ম্মাণের প্রয়োজন নেই। মিলানের দুর্গ নির্ম্মাণ করে ফ্রান্‌সেস্কো স্ফোরজাকে যত

হাঙ্গামা পোহাতে হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও স্ফোরজা পরিবারের পোহাতে হবে, রাজ্যের অন্য শত শত রকমের বিশৃঙ্খলাতেও তা হতো না। এই কারণে রাজার পক্ষে শ্রেষ্ঠ দুর্গ হচ্ছে প্রজাদের ঘৃণার পাত্র না হওয়া। তুমি যত দুর্গই নির্ম্মাণ কর না, সে দুর্গ তোমায় রক্ষা করতে পারবে না, প্রজারা তোমায় ঘৃণা করতে সুরু করলে। কেননা, প্রজারা যদি বিদ্রোহের জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে, তবে তাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত এমন বহিঃশত্রুর কখনো অভাব হবে না। দুর্গ-প্রাকার কোনো রাজার কোনো কাজে এসেছে, এমন কোনো দৃষ্টান্ত, অন্ততঃ বর্ত্তমান যুগে দেখতে পাইনে। একমাত্র দেখি, ফর্লির কাউণ্টেস (Countess of Forli) এর কতকটা সুবিধা হয়েছিল বটে। তাঁর স্বামী কাউণ্ট গিরোলামো (Count Girolamo) যখন নিহত হলেন, তখন তিনি দুর্গে আশ্রয় নিয়ে বিদ্রোহী প্রজাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করেছিলেন। তারপরে মিলান থেকে যখন সাহায্য এলো, তখন তিনি বেরিয়ে এসে দেশে পুনরায় শাসন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করলেন। কিন্তু তা সম্ভব হয়েছিল এই কারণে যে, কোনো বিদেশী শক্তিরই তখন এমন অবস্থা ছিলনা যে প্রজাদের সাহায্যে আসতে পারে। কিন্তু তাঁর পক্ষেও এই দুর্গ-প্রাকার কতখানি কাজে এসেছিল, যখন সিজারী বর্জ্জিয়া এর কিছু দিন পরে এসে সে দেশ আক্রমণ করেছিলেন ও প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ? কাজেই দুর্গ-প্রাকারের উপর নির্ভর না করে তিনি যদি প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় বারেই প্রজাদের খুসী করবার চেষ্টা করতেন—অন্ততঃ তিনি যাতে প্রজাদের ঘৃণার পাত্র হয়ে না পড়েন, তার ব্যবস্থা করতেন, তবেই সব চেয়ে ভালো কাজ হোতো। অতএব সবদিক বিবেচনা করে, আমি তাঁকেও প্রশংসা করবো, যিনি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন না এবং তাঁকেও করবো, যিনি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

কিন্তু যিনি শুধু সেই দুর্গের উপর নির্ভর করে, প্রজাদের ঘৃণার পাত্র হওয়ার সম্ভাবনা এড়িয়ে চলার আবশ্যকতা অনুভব করেন না, তাঁর সে কাজ সর্ব্বথা নিন্দনীয়।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সুখ্যাতি লাভের উপায়

বড় বড় দুঃসাহসিক কাজ ও মহৎ কাজে যেমন সুনাম ও সুখ্যাতি বাড়ে, তেমন আর কিছুতেই হয় না। বর্ত্তমান স্পেন-রাজ আরাগণের ফার্ডিনাণ্ডের (Ferdinand of Aragon) কথাই ধর না। তিনি ছিলেন স্পেনের ক্ষুদ্র একটা প্রদেশের নগণ্য রাজা। কিন্তু নিজের প্রচেষ্টা ও কর্ম্মদক্ষতার ফলে তিনি এখন সমস্ত খৃষ্টীয় জগতের সর্ব্ব প্রধান রাজা হয়েছেন। তিনি এত বড় হয়েছেন যে, তাঁকে সম্পূর্ণ নূতন রাজা বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না। তাঁর কার্য্য-কলাপ আলোচনা করে এ কথা বলতেই হবে যে, তার প্রত্যেকটা কাজই বিপুল, বৃহৎ এবং কতকগুলি একবারেই অনন্যসাধারণ। রাজত্ব সুরু করেই তিনি গ্রাণাডা আক্রমণ করেছিলেন। এই অভিযানই তার বিপুল সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন করেছে। প্রথমে তিনি কোনো জাঁক-জমক না করে, নিরিবিলিতে সমস্ত ব্যবস্থা করেছেন, যাতে গোড়াতেই একটা মস্ত বড় প্রতিবন্ধক এসে না জোটে। কাষ্টিলের ব্যারণরা (Barons of Castille) প্রথমটা যুদ্ধের ভাবনা-চিন্তাতেই ব্যস্ত ছিলেন,—একবারও ভাবেন নি যে এই অভিযানের সাফল্যের ফলে ফার্ডিনাণ্ডের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কোনো পরিবর্ত্তন হ'তে পারে। ফার্ডিনাণ্ডের শক্তি যে বেড়ে যাচ্ছে এবং তাদের উপরেও তার কর্ত্তৃত্বের পাকা বনিয়াদ গড়ে উঠছে, তা তারা মনেও করেন নি। চার্চ্চ ও জনসাধারণের টাকায় তিনি সৈন্যবাহিনী

গড়ে তুলেছেন ও যুদ্ধ চালিয়েছেন এবং সুদীর্ঘ কাল ধরে এই যুদ্ধে ব্যাপৃত থেকে সামরিক কলা-কৌশল সম্বন্ধে সবিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। পরবর্ত্তী জীবনে এই সামরিক কলা-কৌশলেই তিনি প্রচুর প্রশংসা অর্জ্জন করেছিলেন। তারপরে তিনি যখনই বড় বড় কাজে হাত দিতেন, ধর্ম্মের অজুহত দেখিয়ে ও ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে অন্য রাজাদের ঠাণ্ডা রাখতেন। তিনি যে স্পেন দেশ থেকে মূরদের মেরে কেটে তাড়িয়েছেন এবং আর যে সব নিষ্ঠুর অত্যাচার করেছেন, সবই ধর্ম্মবুদ্ধিদ্বারা প্রণোদিত ও ধর্ম্মভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে করেছেন—এমনি ভাবখানা দেখাতেন। ফাডিনাণ্ড আপন কাজ-কর্ম্মে যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, তা এমন চমৎকার ও অনন্যসাধারণ যে বলবার নয়। তারপরে, তিনি আফ্রিকায় গিয়ে যুদ্ধ চালিয়েছেন, ইতালীতে এসে উপস্থিত হয়েছেন, ফরাসী দেশ আক্রমণ করেছেন—সবই সেই এক অজুহতে। তিনি সর্ব্বদা বড় বড় কাজের কল্পনা করতেন ও বড় বড় কাজে হাত দিতেন। সাধারণ লোক তার কল্পনা ও কাজের বিপুলতায় বিস্ময় বিমুগ্ধ হোত, তার ফলাফল বিচারে ব্যাপৃত থাকতো। আর, তাঁর একটা কাজের ফেঁকড়া থেকে আর একটা কাজ এমন ভাবে হুড়মুড় করে ঘাড়ে এসে চাপতো যে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো একটা কিছু পাকিয়ে তুলবার অবসর কেউ পেতো না।

রাষ্ট্রের ঘরোয়া ব্যাপারে একটা অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখানো কিম্বা অন্য কেউ দেখালে তাতে উৎসাহ দেওয়া রাজার সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। তাতে তাঁর নিজেরই যথেষ্ট উপকার। মেসার বার্ণাবো দা মিলানো (Messer Bernabo da Milano) এরূপ কাজের সুবিধা জুটলে, কখনো ছাড়তেন না। কেউ যদি তার ব্যক্তিগত জীবনেও কোনো অসাধারণত্ব দেখাতো, তা কখনো তাঁর নজর এড়াতো না। তিনি

অবিলম্বে ভাল কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তির ব্যবস্থা করতেন। তাতে হোতো এই যে, সকলেই তা নিয়ে আলোচনা করতো ও তার প্রশংসায় শতমুখ হয়ে উঠতো। রাজা যে কাজেই হাত দেবেন, তা এমন ভাবে করবার চেষ্টা করা উচিত, যাতে 'মহান ও অনন্যসধারণ লোক' বলে সুনাম রটে।

মানুষ দুই প্রকারের লোককে সম্মান করে—এক যে সত্যি সত্যি বন্ধু, আর যে ঘোরপ্যাঁচ না রেখে স্পষ্টভাবে শত্রুতা করে। রাজা এইভাবে চলেও সম্মানের পাত্র হ'তে পারেন। যখন দুই পক্ষে দ্বন্দ্ব চলে, তখন রাজার এক পক্ষ নেওয়া উচিত এবং তা এমনভাবে যাতে কারো মনে কোন সংশয় না থাকে। কোনো পক্ষে যোগ না দিয়ে উদাসীন হয়ে থাকা ভাল কথা নয়। তার ফল কখনো ভাল হয় না। মনে কর, তোমার দুই শক্তিমান প্রতিবেশীর ভিতরে ঝগড়া লেগেছে। তাদের মধ্যে যে জিতবে, তাকে হয় তোমার ভয় করে চলতে হবে, কিম্বা তোমার তুলনায় সে এতই ক্ষুদ্র যে তোমার কোনো ভাবনার কারণ নেই। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই যে কোনো এক পক্ষে তোমার যোগ দেওয়া উচিত। উদাসীন থাকার চেয়ে তাতে তোমার লাভ বেশী হবে। বিজয়ী পক্ষ যদি এমন হয় যে তাকে তোমার ভয় করে চলার কারণ আছে, তবে তোমার কোনো পক্ষে যোগ না দেওয়া, আর আত্মহত্যা করা একই কথা। বিজয়ী পক্ষ অবিলম্বেই যে তোমার টুঁটি চেপে ধরবে, তাতে সন্দেহ নেই এবং বিজিত পক্ষও তাতে খুসী হবে। তখন কেউ তোমায় রক্ষা করতে আসবে না—কোথাও তোমার আশ্রয় মিলবে না এবং কেন যে অন্যে তোমায় সাহায্য করবে, তার কোনো কারণও দেখাতে পারবে না। বিজয়ী পক্ষ তখন আর তোমার কোনো কথাই শুনবে না। কেননা, যার বন্ধুত্ব সম্বন্ধে সে নিঃসংশয় নয়—যে বিপদের দিনে সাহায্য

করে না, তেমন বন্ধুর তার কি প্রয়োজন। তারপরে, বিজিত পক্ষের তো কথাই নেই। তার বিপদে যখন তুমি তার পাশে এসে দাঁড়াও নি, তখন আর তোমার প্রতি তার কোনো সহানুভূতিই থাকতে পারে না।

ইটোলিয়ানদের (Ætolians) আহ্বানে আন্টিয়োকাস (Antiochus) এসেছিলেন গ্রীস দেশ থেকে, রোমানদের তাড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে। গ্রীসের আকিয়ানরা (Acheans) ছিল রোমানদের সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ। আন্টিয়োকাস তাদের অনুরোধ করে পাঠালেন, নিরপেক্ষ থাকতে। অন্যদিকে রোমানরা পীড়াপীড়ি করতে লাগলো তাদের পক্ষে যোগ দিতে। তখন আকিয়ানদের সভা বসলো এ বিষয়ের মীমাংসার জন্যে। সেই সভায় আন্টিয়োকাসের প্রতিনিধি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানালে তাদের নিরপেক্ষ থাকতে। তখন রোমানদের প্রতিনিধি জবাব দিলে—"এই যে বলা হলো যে তোমাদের পক্ষে কোন দলের সঙ্গে যোগ না দিয়ে নিরপেক্ষ থাকাই সুবিধাজনক, এর চেয়ে ভুল কথা আর নেই। কেননা, কোনো দিকে যোগ না দিলে, বিজয়ী পক্ষ পরে আর তোমার কোনো সুবিধা-অসুবিধার বিবেচনা করবে না—কোনো অনুগ্রহ দেখাবে না।" অতএব এইটেই নিত্যকালের সত্য জানবে—যে তোমার প্রকৃত বন্ধু নয়, সে-ই বলবে তোমায় নিরপেক্ষ থাকতে। আর যে সত্যিই খাঁটি বন্ধু, সে অনুরোধ-উপরোধ জানাবে তোমায় তার সঙ্গে অস্ত্র হাতে নেমে পড়তে। কিন্তু যারা অস্থির-মতি—যথেষ্ট মনের বল ও স্থির বুদ্ধি যাদের নেই, তারা সমূহ বিপদ এড়িয়ে গিয়ে নিরপেক্ষ থাকতে চাইবে এবং তার ফলে নিজেরই সর্ব্বনাশ ডেকে আনবে। তার চেয়ে সাহসে ভর করে এক পক্ষে যোগ দেওয়া ভাল। যে পক্ষে তুমি যোগ দিবে, সে পক্ষ যদি জয়লাভ করে এবং সে যদি

এমন শক্তিমান হয়, যে তোমার তার হাতে ঘোরা ছাড়া উপায় নেই, তাহলেও তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই। কেননা, একে তো তোমার সঙ্গে সে সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ,—তারপরে সে তোমার প্রতি কতকটা কৃতজ্ঞতার ভাব পোষণ না করে পারবে না। মানুষ সত্যিই এত নির্লজ্জ হ'তে পারে না, যে তোমার কাছ থেকে সময়োচিত সাহায্য পেয়েও তোমার উপরেই যথেচ্ছ অত্যাচার চালিয়ে অকৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখাবে। তা ছাড়া, জয়ী হয়েও মানুষ কখনো নিজেকে এতটা নিরাপদ মনে করতে পারে না, যাতে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করাও সে আবশ্যক বিবেচনা করবে না। তারপরে, যে পক্ষে তুমি যোগ দেবে, সে পক্ষ যদি হেরেও যায়, তাহলেও তুমি অসহায় ও বন্ধুহীন হয়ে পড়বে না। যার সঙ্গে তুমি যোগ দিয়েছ, সে যতদিন পারে, তোমাকে সাহায্য করবেই এবং ভবিষ্যতে যখন তার সুদিন ফিরে আসবে, তখন তোমারও সুবিধা হয়ে যাবে।

যেখানে উভয় পক্ষেরই শক্তি এত সামান্য যে, যে পক্ষই জয়লাভ করুক, তাতে তোমার কিছু আসে যায় না, সেখানে কোনো এক পক্ষে যোগ দেওয়া তো আরো ভাল কথা। সেখানে তোমার তুলনায় উভয় পক্ষই দুর্ব্বল বলে, তাদেরই উচিত পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করা, যাতে তুমি তাদের কারো কোনো ক্ষতি করতে না পার। যদি তা না করে, তারা যখন নিজেরাই বিবাদ করে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করে, তখন তোমার পক্ষে একান্তই উচিত, এক পক্ষকে সাহায্য করে অপর পক্ষের ধ্বংস সাধন করা। এরূপ ক্ষেত্রে যে পক্ষে তুমি যোগ দেবে, সে পক্ষের জয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু জয়ী হয়েও সে সম্পূর্ণরূপে তোমার মুঠোর ভিতরেই এসে যাবে। এ থেকে এই বুঝতে হবে যে, তোমার চেয়েও বেশী শক্তিশালী কোনো বন্ধুর ভরসায় ও তার সাহায্য নিয়ে, কখনো

অপর কারো সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে না। অবশ্যি যখন তুমি নিজেই আক্রান্ত হবে তোমার কোনো শত্রুদ্বারা, তখন বিপদে তেমন বন্ধুর সাহায্যও নেওয়া দরকার হতে পারে। সেরূপ বিপদে পড়লে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। অন্যথায় তা করা উচিত নয়। কেননা, তার সাহায্যে যদি তুমি জয়লাভ কর, তথাপি তোমাকে তার হাতের পুতুল হয়ে থাকতে হবে এবং যাতে কারো হাতের পুতুল হয়ে থাকতে হয়, তেমন সম্ভাবনা সর্ব্বদা এড়িয়ে চলা উচিত। ভেনেসিয়ানরা ফরাসী শক্তির সাহায্য নিয়ে মিলানের ডিউকের সঙ্গে লড়াই করেছিল। পরে, তাদের বন্ধু সেই ফরাসী শক্তির হাতেই তাদের সর্ব্বনাশ হয়েছিল। অথচ এর সম্ভাবনা তারা ইচ্ছা করলেই এড়িয়ে চলতে পারতো। এমন অবস্থায়ও অবশ্যি পড়তে হোতে পারে, যখন এরূপ কোনো শক্তির সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। ফ্লোরেন্সবাসীরাও এমনি অবস্থায়ই পড়েছিলো, তখন স্পেন ও পোপের সৈন্য এক সঙ্গে এসে লম্বাড়ি আক্রমণ করেছিল। এরূপ ক্ষেত্রে অবশ্যি এই দুই শক্তির কোনো এক শক্তিকে নিজের পক্ষে পাওয়ার চেষ্টা করাই উচিত। কেন যে তা করা উচিত, তা পূর্ব্বেই বিশদভাবে আলোচনা করেছি।

এ কথা বিশেষ ভাবে জেনে রাখা দরকার যে, কোনো রাষ্ট্রের পক্ষেই সব সময়ে সম্পূর্ণ নিরাপদ পথ বেছে নেওয়া সম্ভব নয়। বরং এমন পথেই অনেক সময় চলতে হয়, যে পথে একটা না একটা বিপদের সম্ভাবনা আছেই। কেননা সাধারণ সাংসারিক ব্যাপারেও ঐরূপ দেখা যায় যে, মানুষ একটা বিপদ এড়াতে গিয়ে আর একটাকে ডেকে আনে। বিপদকে সম্পূর্ণ ফাঁকি দেওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব হয় না। তবে ভবিষ্যৎ বিবেচনায় বিচক্ষণ ব্যক্তি যারা, তারা বাধা-বিপত্তির প্রকৃতি বুঝে, যে পথে হাঙ্গামা কম হতে পারে, সেই পথ বেছে নিয়ে থাকেন।

রাজা এমন ভাবে চলবেন, যাতে সকলেই বোঝে যে তিনি সত্য সত্যই গুণীর প্রতিপালক, মুরব্বি। যে কোনো শিল্পে কেউ কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারলে, রাজার কাছে তার যথোচিত সমাদর হওয়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে রাজা সবাইকে উৎসাহ দিবেন যাতে ব্যবসা, বাণিজ্য ও অন্য যে কোনো জীবিকানির্ব্বাহ ব্যাপারে সবাই শান্ত ভাবে ও নির্ঝঞ্ঝাটে তাদের কাজ-কর্ম্ম করে যায়। তাদের ভরসা দিবেন, যারা টেক্সের ভয়ে কিম্বা তাদের নিজস্ব অপর কেউ কেড়ে নিবে—এই ভয়ে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে সাহস পায় না। আর যারা এই সব কাজে ব্যাপৃত হতে চায়, কিম্বা এমন কোনো কাজ করতে চায়, যাতে রাষ্ট্রের সম্মান ও সুনাম বৃদ্ধি পায়, তাদের জন্য যথোচিত পুরস্কারের ব্যবস্থা করবেন।

তা ছাড়া, বছরের কোনো কোনো সময়ে সুবিধামত ঋতুতে তিনি সাধারণের জন্যে আমোদ-উৎসব নানাবিধ তামাসা দেখাবার ব্যবস্থা করবেন। প্রত্যেক সহরেই বিভিন্ন ব্যবসায়ী সঙ্ঘ বা শিল্পী সঙ্ঘ আছে। রাজার উচিত তাদের কদর বোঝা ও যথোচিত সমাদর করা; কখনো কখনো তাদের সঙ্গে খানিকটা মেলামেশা করা এবং এমন ভাবে সকলের সঙ্গে ব্যবহার করা যাতে সবাই মনে করে যে, তিনি সহৃদয়তা ও সৌজন্যের নিখুঁত আদর্শ। কিন্তু তা সত্ত্বেও কখনো তিনি আপন পদ মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে দিবেন না—কোনো কিছুতে যেন এতটুকুও অন্যথা না হয়, সে দিকে সর্ব্বদা খর দৃষ্টি রাখবেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

রাজকর্মচারী

বহু লোকের ভিতর থেকে উপযুক্ত লোক বেছে কর্ম্মচারী নিয়োগ করা বড় সহজ কথা নয়। রাষ্ট্র ব্যাপারে এর গুরুত্বও খুব বেশী। কর্ম্মচারী ভাল হবে, কি মন্দ হবে, তার নির্ভর করে রাজার বুদ্ধি বিবেচনা ও ভাল মন্দ বেছে নেওয়ার ক্ষমতার উপরে। কর্ম্মচারী উপযুক্ত, কি অনুপযুক্ত—তাই দেখে মানুষ রাজার বুদ্ধি বিবেচনা সম্বন্ধে প্রথম অভিমত গঠন করে। তারা যদি উপযুক্ত ও বিশ্বাসী হয়, তবে তা দেখেই রাজার বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যেতে পারে। কেননা, তা থেকেই বোঝা যায় যে তিনি জানেন, কেমন করে উপযুক্ত লোক বেছে নেওয়া যায় ও তাদের বিশ্বাসপরায়ণ করে রাখা যায়। কিন্তু কর্ম্মচারীরা যদি উপযুক্ত লোক না হয়, তবে তা দেখে কেউই রাজার সম্বন্ধে একটা উচ্চ ধারণা পোষণ করতে পারবে না। কেননা, রাজা যদি নিজে যোগ্য না হন, তবে তার প্রথম ও প্রধান ভুলই হবে এই কর্ম্মচারী নিয়োগ সম্বন্ধে।

সিয়েনার রাজা পান্‌ডোল্‌ফো পেট্রুসি (Pandolfo Petrucci, Prince of Siena) আণ্টোনিয়ো দা ভেনাফ্রোকে (Messer Antinio da Venafro) নিজের কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু যে জানে আণ্টোনিয়াকে, সে কখনই এ জন্যে পান্‌ডোল্‌ফো পেট্রুসির বুদ্ধিমত্তা ও চতুরতার প্রশংসা না করে পারবে না। বুদ্ধির তারতম্য হিসেবে লোকদের তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক যারা, নিজেরাই

বোঝে। দ্বিতীয় যারা অপরে বোঝালে বোঝে। আর তৃতীয় যারা নিজেরাও বোঝে না—অন্যে বোঝালেও বোঝে না। প্রথম দলের লোকেরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, দ্বিতীয় দলের লোকেরাও মন্দ নয়। কিন্তু তৃতীয় দলের লোকেরা একেবারেই কিছু নয়—অক্ষম, অকেজো। অতএব এ কথা অনায়াসেই বলা চলে যে পান্‌ডোল্‌ফো যদি প্রথম দলের লোক না-ও হন—অন্ততঃ তিনি যে দ্বিতীয় দলের অন্তর্গত, তাতে সন্দেহ নেই। এবং দ্বিতীয় দলের লোক হওয়া মন্দ কথা নয়। কেননা, কোনো একটা কথা শুনে কিম্বা কাজ দেখে, তার ভাল মন্দ নিজে না বুঝলেও—অন্তত পক্ষে অন্যে দেখিয়ে দিলে যিনি বুঝতে পারেন, তার পক্ষে কর্ম্মচারীদের কাজের ভাল মন্দ বিচার করা সম্ভবপর। তার ফলে তিনি সময় মত কর্ম্মচারীদের ভুল দেখিয়ে তাদের সংশোধনের ব্যবস্থা করতে পারবেন, কিম্বা তাদের ভাল কাজের প্রশংসা করে তাদের উৎসাহিত করতে পারবেন। তাকে এতটা সজাগ দেখলে, কর্ম্মচারীরাও তার সঙ্গে প্রতারণা করতে ভরসা পাবে না। ফলে তারা সৎ ও বিশ্বাসপরায়ণ হয়েই কাজ করতে থাকবে।

কিন্তু কর্ম্মচারীরা কেমন ও কতখানি বিশ্বাসী, তা ঠিক মত বুঝতে হোলে, একটা নির্ভুল পরীক্ষার আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। তা হচ্ছে এই। যখনই দেখবে যে, কোনো কর্ম্মচারী তোমার স্বার্থ থেকেও তার নিজের স্বার্থের কথা ভবে বেশী এবং সব কিছুতে মনে মনে কেবল নিজের লাভটাই খোঁজে ব্যগ্র ভরে, তখনি বুঝবে সে লোকের দ্বারা তোমার কাজ হবে না। এমন লোকের উপরে তুমিও বেশী দিন বিশ্বাস রাখতে পারবে না। যখন অপর কারো বিষয়-সম্পত্তির ভার তোমার হাতে পড়ে, তখন তোমার আর নিজের স্বার্থের কথা ভাবা উচিত নয়—সব সময় এই এক মাত্র খেয়াল রাখা উচিত, কি করে যার সম্পত্তির

ভার নিয়েছ, তার স্বার্থ রক্ষিত হবে এবং যে সব ব্যাপারের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, সে দিকে ভুলেও দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয়।

অপর দিকে কর্ম্মচারীরা যাতে বিশ্বাস রক্ষা করে কাজ-কর্ম্ম করে, তার জন্য রাজার নিজের তাদের প্রতি নজর রাখা উচিত—সব সময় উপযুক্ত সম্মান দেখানো উচিত—তারা যাতে দুপয়সা পায় সে দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত—আরো নানা রকমে তাদের প্রতি সদাশয়তা দেখানো উচিত এবং তাদের সুখ, সম্মান ও ভাবনা-চিন্তার অংশ নেওয়া উচিত। কিন্তু বেশী করে সম্মান ও সম্পত্তি পেয়ে কোনো কোনো কর্ম্মচারীর পাওয়ায় আকাঙ্ক্ষাটা অসম্ভব রকম বেড়ে যেতে পারে। তাই রাজা এমন ভাবে সব ব্যবস্থা করবেন যাতে কর্ম্মচারী নিঃসন্দেহে বুঝতে পারে যে তার পিছনে যদি রাজার শক্তি ও সম্মতি না থাকে, তাহলে সে কিছুই নয়—অধিকন্তু সে ক্ষেত্রে উৎকণ্ঠা ও ভাবনা-চিন্তার অন্ত থাকবে না। এই ভয়টা যদি তার মনে সব সময়ে জেগে থাকে, তবে আর সে কোনো পরিবর্ত্তনের জন্যে লালায়িত হবে না। রাজা ও কর্ম্মচারীর মধ্যে উভয়ের প্রতি উভয়ের মনোভাব যদি এরূপ হয়, তবে উভয়েই উভয়ের উপর বিশ্বাস ও ভরসা রেখে চলতে পারবে। কিন্তু তাদের মনোভাবটা যদি ঠিক এর উলটো হয়, তবে তার ফল উভয়ের পক্ষেই বিষময় হবে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

চাটুকার

আর একটা দরকারী বিষয় আছে। সে সম্বন্ধে একেবারে চুপ করে যাওয়া ঠিক হবে না। তা হচ্ছে চাটুকারদের সম্বন্ধে। রাজা যদি অতি সাবধানে ভাল মন্দ বিচার করে চলতে না পারেন, তবে এই চাটুকারদের থেকে তার অনিষ্টের সম্ভাবনা খুব বেশী। একে তো আজকালকার দিনে সব রাজার দরবারই চাটুকারে ভর্ত্তি। তার উপরে আবার মানুষ নিজের কার্য্যকলাপে এত আত্মপ্রসাদ অনুভব করে ও সে সম্বন্ধে প্রশংসা করে তাকে এত সহজে প্রতারণা করা সম্ভব যে, চাটুকারদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা যে কোনো রাজার পক্ষেই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তারপরে, তুমি যদি আত্মরক্ষা করতে চাও, তাহলেও আবার তুমি সহজেই লোকের অবজ্ঞার পাত্র হয়ে পড়বে। এরূপ ক্ষেত্রে আত্মরক্ষা করার একটি মাত্র যে উপায় আছে, তা হচ্ছে চাটুকারদের বুঝতে দেওয়া যে সত্য কথা শুনতে তুমি ভয়খাও না কিম্বা তাতে অসন্তুষ্টও হও না। কিন্তু তার ফলে সকলেই যদি তোমায় সত্য কথা শুনাতে আসে এবং তুমি কোনো বাধা না দাও, তবে তার ফলে কেউ আর তোমায় শ্রদ্ধার চোখে দেখবে না।

তাই যিনি বুদ্ধিমান তিনি মধ্য পথ অবলম্বন করেন। তিনি বেছে বেছে জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিযুক্ত করে তাদেরই শুধু সত্য কথা বলবার অধিকার দেন এবং তা-ও শুধু তিনি নিজে যে বিষয়ে প্রশ্ন করেন, সেই বিষয়ে—অন্য কোনো বিষয়ে নয়। কিন্তু তার উচিত আপনা থেকেই

সব বিষয়ে এদের প্রশ্ন করা এবং তাদের মতামত শুনে নিয়ে যা করার, তা নিজেই স্থির করা। রাজা যখনই এদের সঙ্গে মিশবেন—তা এক এক জনের সঙ্গে আলাদা ভাবেই হোক্, কিম্বা সকলকে এক সঙ্গে নিয়ে দলে বলেই হোক্,—নিজের ব্যবহারে সর্ব্বদা তাদের এই কথাটা বুঝতে দেবেন যে, তিনি সত্য কথাই পছন্দ করেন এবং তাদের মধ্যে যিনি যত স্পষ্ট করে সত্য কথা বলবেন, রাজা তার প্রতি তত বেশী খুসী হবেন। কিন্তু এদের ছাড়া আর কারো কথায় তাঁর কান দেওয়া উচিত নয়। রাজা সব সময়ে নিজের সংকল্পে দৃঢ় থাকবেন—যে কাজ করবেন বলে একবার স্থির করেছেন, অন্যের কথা শুনে কখনো তার অন্যথা করা উচিত নয়। যিনি এভাবে না চলেন, চাটুকারেরাই তার দফা রফা করে ছাড়ে, কিম্বা তার ঘন ঘন মত পরিবর্ত্তনের ফলে সবাই তাঁকে অবজ্ঞার চোখে দেখতে থাকে।

এ সম্বন্ধে আমি বর্ত্তমান যুগের একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ফ্রা লুকা (Fra Luca) বর্ত্তমান সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ানের (Maximilian) একজন কর্ম্মসচিব। তিনি সম্রাট সম্বন্ধে বলেছেন যে তিনি কারো সঙ্গেই পরামর্শ করেন না, অথচ কোনো কিছুতেই নিজের মত বজায় রেখে কাজ করতে পারেন না। তার কারণ হচ্ছে, রাজার পক্ষে যে ভাবে চলবার কথা পূর্ব্বে বলেছি, তিনি তার ঠিক উলটো ভাবে চলতেন। সম্রাট ছিলেন মন গোমরা প্রকৃতির মানুষ—নিজের মতলব তিনি কখনো কাউকে খুলে বলতেন না, কিম্বা অন্য কারো কাছে কোনো পরামর্শও জিজ্ঞেস করতেন না। কিন্তু যখনই তিনি তার মতলব কাজে পরিণত করতে আরম্ভ করতেন, তখনই তা প্রকাশ হয়ে পড়তো এবং সবাই জানতে পারতো, তিনি কি করতে যাচ্ছেন। তৎক্ষণাৎ চারদিক থেকে সবাই সে কাজে বাধা দিতে থাকতো। এ অবস্থায়, যে কোনো

বাধা না মেনে এগিয়ে যাওয়া, তেমন শক্ত স্বভাবের মানুষও তিনি নন। ফলে চার দিক থেকে বাধা পেয়ে, নিজের মতলবটাই ছেড়ে দিতে তিনি বাধ্য হতেন। তাই তার কোনো কাজেই স্থিরতা নেই—আজ যা ধরেন, কালই আবার হয়তো তার অন্যথা করেন। তিনি যে কি চান ও কখন যে কি করবেন, সে সম্বন্ধে কারো কিছু বুঝবার যো নেই, কিম্বা কোনো বিষয়ে কোনো সংকল্প স্থির করা সত্ত্বেও, তিনি যে শেষ পর্য্যন্ত তা কার্য্যে পরিণত করবেনই—এমন ভরসা করা যায় না।

অতএব রাজার উচিত সব সময়ে অন্যে সঙ্গে পরামর্শ করা—অন্যের মতামত শোনা। কিন্তু তিনি এমন ভাবে চলবেন, যাতে কেউ যখন তখন তাকে পরামর্শ দিতে না আসে। তিনি যখন পরামর্শ চাইবেন, কেবল তখনই তারা পরামর্শ দিতে পারে—অন্য সময়ে পরামর্শ দিতে আসাটা কখনো তাঁর বরদাস্ত করা ঠিক হবে না। যদি কেউ আপনা থেকে পরামর্শ দিতে আসে, তিনি এমন ভাব দেখাবেন, যাতে তারা বোঝে যে তিনি এ সব পছন্দ করেন না। কিন্তু তাঁর নিজেরই সব সময়ে লক্ষ্য থাকা উচিত যাতে লোকে বোঝে যে তিনি অনবরতই পরামর্শ জিজ্ঞেস করছেন এবং যে প্রশ্ন তিনি করেন, সে বিষয়ে সকলের মতামত তিনি ধৈর্য্যের সঙ্গে মন দিয়ে শোনেন। কিন্তু তিনি যদি বোঝেন যে কেউ সত্য কথাটা বলেনি—তা যে কারণেই হোক না কেন—তিনি স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেবেন অসত্য কথায় তিনি রুষ্টই হন—খুসী হন না।

রাজা তার সভাসদ্‌দের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করেন দেখে কেউ কেউ মনে করতে পারে যে রাজার নিজের বুদ্ধি নেই—তিনি যে সব কাজ করেন, তা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হলেও, তাতে তার নিজের কোনো কৃতিত্ব নেই। কেননা তিনি ধার করা বুদ্ধিতেই কাজ করে

থাকেন। কিন্তু এরূপ মনে করা ভুল। এ কথা নিত্যকালের সত্য যে, নিজের বুদ্ধি যার নেই, সে কখনো ধার করা বুদ্ধিতে বুদ্ধিমানের মত কাজ করতে পারে না। কেননা, সৎ উপদেশ পেলেও, সে সেটাকে ভাল বলে বুঝতে পারে না। একটা অবস্থা শুধু কল্পনা করা যেতে পারে, যখন তেমনটা হওয়া অসম্ভব নয়। তা হচ্ছে, যখন দৈবক্রমে রাজা কোনো বিচক্ষণ বুদ্ধিমান লোকের হাতে তার সমস্ত বিষয় কর্ম্মের ভার ন্যস্ত করেন। সেরূপ অবস্থায় তার রাজ্য ভাল ভাবেই শাসিত হতে পারে বটে, কিন্তু যে রাজ্য তার নামে চলছিল, তা অচিরেই খতম হয়ে যাবে। কেননা এরূপ ক্ষেত্রে সে কর্ম্মচারী যে নিজেই একদিন রাজা হয়ে বসবে, তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু কোনো অনভিজ্ঞ নূতন রাজা যদি বহু লোকের কাছ থেকে পরামর্শ নেন, তবে তার অসুবিধার অন্ত থাকবে না। কেননা, বিভিন্ন লোক বিভিন্ন মতই দেবে—তাদের কাছ থেকে কোনো সুসংহত মতের আশা করা যায় না। অথচ তাঁর নিজেরও এমন অভিজ্ঞতা নেই, যাতে সেই বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য করে, তা থেকে একটা সুষ্ঠু, সুসংহত মত গড়ে তুলতে পারেন। মানুষ স্বভাবতঃই স্বার্থপর। তাই প্রত্যেক পরামর্শদাতাই নিজের স্বার্থের দিকে চেয়ে কথা কইবে। অভিজ্ঞতার অভাবে ও একান্ত নূতন বলে, রাজা তাদের বশেও রাখতে পারবেন না, কিম্বা তাদের মতের পেছনে যে মতলবখানা কি, তা-ও ধরতে পারবেন না। এর কখনই অন্যথা হ'তে পারে না। কেননা, মানুষকে যদি জোর করে সৎপথে চালাতে না পারে, তবে সে নিজের ইচ্ছা সুখে কখনই সততা রক্ষা করে চলবে না। অতএব একথা নিঃসন্দেহ যে, যার বুদ্ধি আছে, তারই সদুপদেশ মিলতে পারে—অর্থাৎ তার বুদ্ধিই অন্যের ভিতরে সদুপদেশ দেবার প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলে—সদুপদেশ থেকে কখনো রাজার ভিতরে বুদ্ধির উদয় হ'তে পারে না।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

'ইতালীর রাজারা কেন রাজ্যহারা হয়েছেন ?'

পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে সব ব্যবস্থা ও নিয়ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি, সেই অনুসারে চললে যে কোন নূতন রাজাও তাঁর নব-প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও দীর্ঘস্থায়ী শাসন গড়ে তুলতে পারেন। এমন কি, সেরূপ ক্ষেত্রে তাঁর রাজত্বের ভিত্তি এতটা সুদৃঢ় হওয়া সম্ভব যে তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে রাজা হলেও, ততটা হ'তে পারতেন না। মানুষ প্রথম প্রথম নূতন রাজার কাজ-কর্ম্মের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখে—উত্তরাধিকার সূত্রে যারা রাজা হয়, তাঁদের সম্বন্ধে তারা ততটা ঔৎসুক্য প্রকাশ করে না। তাই যখন তারা দেখে যে নূতন রাজা সুনিপুণ ও দক্ষ লোক, তখন লোক ক্রমে অধিক সংখ্যায় তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে এবং অনুরক্তও বেশী হয়। মানুষ অতীতের চেয়ে বর্ত্তমানটাকেই বড় করে দেখে এবং বর্ত্তমান যদি শুভ-সম্পদের সন্ধান এনে দেয়, তবে তার আনন্দেই তারা মসগুল হয়ে থাকে। তখন আর অতীতে কি হয়েছে, না হয়েছে, তার খোঁজ করা আবশ্যক মনে করে না। পরন্তু রাজা যদি তাদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রেখে চলেন এবং সে বিষয়ে তাদের নিরাশার কারণ যদি না ঘটে, তবে রাজার বিপদের দিনে তারা প্রাণ দিয়ে তাঁকে রক্ষা করবে। এইটেই হবে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব। একদিকে তিনি নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন—এই এক কীর্ত্তি। 'অপর দিকে আবার ভাল আইন-কানুন ও যথোচিত সামারিক বলের ব্যবস্থা করে, ভাল ভাল বন্ধু জুটিয়ে ও নিজের কাজ-কর্ম্মের সৎ

দেখিয়ে, তিনি সেই নব-প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের শাসন-শৃঙ্খলা সুদৃঢ় করে তুলেছেন—সে হবে তাঁর আর এক কীর্ত্তি। কিন্তু যিনি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন ও উত্তরাধিকার সূত্রে রাজা হয়েও, নিজের বুদ্ধির দোষে রাজ্য রক্ষা করতে না পারেন, তাঁর পক্ষে তা হবে অশেষ অপকীর্ত্তি ও লজ্জার কথা।

নেপেল্স্-রাজ, মিলানের ডিউক প্রভৃতি ইতালীর অনেক রাষ্ট্র-নায়কগণ, আমাদের এই বর্ত্তমান যুগেই, রাজ্য হাতে পেয়েও তা রাখতে পারেন নি। কেননা তাঁরা সকলেই একটা মস্ত ভুল করেছেন সৈন্য সংগ্রহের ব্যাপার নিয়ে। তাঁদের প্রত্যেকেই ভাড়াটে সৈন্য দিয়ে নিজের সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলে সর্ব্বনাশ ডেকে এনেছিলেন। ভাড়াটে সৈন্য যে কতখানি অনর্থের কারণ হয়, তা পূর্ব্বেই বিশদভাবে আলোচনা করেছি। তা ছাড়া, তাঁদের কেউ কেউ জনসাধারণকে শত্রু করে তুলেছিলেন। তাঁদের মধ্যে যিনি জনসাধারণকে নিজের পক্ষপাতী রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন, তিনি আবার অভিজাত সম্প্রদায়কে হাতে রাখতে পারেন নি। এই সব দোষ ত্রুটি যিনি সামলে চলতে পারেন—আর যুদ্ধ বাধলে উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্যের ব্যবস্থা করতে পারেন, তার আর কোনো আশঙ্কার কারণ থাকে না।

একটা দৃষ্টান্ত দেই। বিশ্ব-বিখ্যাত আলেকজাণ্ডারের পিতার নাম ছিল ফিলিপ। তিনি ছাড়াও ফিলিপ নামে মাসিডোনের আর একজন রাজা ছিলেন, যাকে টিটাস্ কুইন্টিয়াস্ (Titus Quintius) যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। গ্রীস ও রোমানরা একসঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। কিন্তু তাঁদের উভয়ের তুলনায় ফিলিপের রাজ্যের পরিমাণ ছিল নিতান্তই নগণ্য। তবে তিনি নিজে ছিলেন যুদ্ধপ্রিয়, প্রকৃতিতে পুরোদস্তুর সামরিক ভাবাপন্ন। জনসাধারণ ও অভিজাত

সম্প্রদায়কে কি করে হাতে ও বশে রাখা যায়, তা তিনি ভাল করেই জানতেন। তাই এই বিপুল শক্তিসংহতির বিরুদ্ধে তিনি একাই বহু দিন ধরে যুদ্ধ চালাতে সমর্থ হয়েছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য তাঁকে রাজ্যের কতকটা অংশ ছেড়ে দিতে হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তখনো রাজাই ছিলেন—রাজ্যহীন হয়ে তখনো তাঁকে সাধারণ দশ জনের এক জন হোতে হয়নি।

ইতালীর বহু রাজা রাজ্য হাতে পেয়েও যে তা বেশীদিন রাখতে পারেন নি, সে জন্য তাঁদের অদৃষ্টের 'পরে দোষ চাপিয়ে লাভ নেই—তাঁদের আলস্য ও ঢিলেমিই তার জন্য দায়ী। মানুষের কেমন যেন একটা স্বভাবেরই দোষ যে ঝড়-ঝঞ্ঝা, দুর্য্যোগ, ঘাড়ের উপর এসে না পড়লে, তারা আগে থেকে তার জন্যে কোনো ব্যবস্থা করে রাখে না। ইতালীর রাজন্যবর্গও শান্তির দিনে কখনো ভাবতে পারতেন না যে এমন দিন চিরকাল থাকবে না। তারপরে যখন সত্যি সত্যি দুর্দ্দিন এসে উপস্থিত, তখনি 'যঃ পলায়তি, সঃ জীবতি'—এই পন্থা অনুসরণ করেছেন—বিপদের সঙ্গে লড়াই করে যে আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখা যেতে পারে—একথা তাঁরা ভাববারও অবসর পান নি। তাঁরা শুধু এই আশার উপরে নির্ভর করেছেন যে, বিজয়ীর অত্যাচারে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে দেশের লোক আপনা থেকেই পরে আবার তাঁদেরকে ডেকে আনতে বাধ্য হবে। যখন আর কোনো পথই থাকে না, তখন এ-ও একটা পথ বটে। কিন্তু অন্য কোনো পথে চেষ্টা না করে, প্রথমেই এই পথ অবলম্বন করা নিতান্ত ভুল কাজ। পরে আর কেউ এসে তার রাজ্য উদ্ধার করে দেবে—এই ভরসায় কে চায় নিজের রাজ্য খোয়াতে? কেউ-ই চায় না। কেননা ঘটনাক্রমে তার সে আশা ফলবতী না হোতেও পারে, কিম্বা যদি হয়ও, তবু তাতে করেই

তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ হলেন, তেমনটা মনে করার কোনো কারণ নেই। কেননা, বিপদে নিজেকে যে রক্ষা করতে পারেনা—অন্য এসে রক্ষা করলে, তবে তার রক্ষা, তার সে ভাবে রক্ষা পেয়েই বা কি সুবিধা হবে। যে রক্ষাকর্ত্তা হয়ে আসবে, সেই হয়তো পরে তার ঘাড়ে চেপে বসবে। অতএব সব কথার সার কথা হচ্ছে—“বলং বলং বাহু বলং”—নিজের শক্তিতে যতটুকু অর্জ্জন করতে পারবে, ততটুকুই জানবে সত্যিকারের খাঁটি ও দীর্ঘস্থায়ী—যার উপরে স্বচ্ছন্দে নির্ভর করা চলে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

দৈব ও পুরুষকার

আমি জানি, এমন বহুলোক আছে, যারা মনে করে যে জাগতিক সমস্ত ব্যাপার দৈব বশে বা ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটে। যা হবার, তা হবেই—মানুষ তার শতবুদ্ধি খরচ করেও তার অন্যথা করতে পারে না। ঘটনার যে স্বাভাবিক গতি, তাকে প্রতিহত করাও মানুষের অসাধ্য কিম্বা তাকে সাহায্য করে তার বেগ বৃদ্ধি করার চেষ্টাও বৃথা। অতএব জাগতিক ব্যাপারে ও সংসারের কাজকর্ম্মে মানুষের প্রাণান্ত পরিশ্রম একান্তই পণ্ডশ্রম। সবই যখন দৈবের খেলা, তখন দৈবের উপর নির্ভর করে চলাই ভাল। অল্প দিনের ভিতরে এমন সব অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে, যা মানুষ কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। তাই আজকের দিনে দৈবের উপরে বিশ্বাস মানুষের যেন দৃঢ় প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছে। দৈবের উপরে এতটা দৃঢ় বিশ্বাস বোধ হয় মানুষের আর কখনো ছিল না। আমিও এ বিষয়ে অনেক ভেবেছি। আমারও মনে হয়, মানুষের এই বিশ্বাস অনেকটা সত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। তবু মানুষের জীবনে পুরুষকারের স্থান যে একেবারেই নেই, তা আমি মনে করিনে। তাই আমার বিশ্বাস যে মানুষের ভাগ্যের অর্দ্ধেকটা, কিম্বা তার চেয়েও কিছু কম, মানুষের আপন পুরুষকারের হাতে এবং বাকীটাতে দৈবের অকুণ্ঠ অধিকার।

দৈব যেন নদীর মত। যখন নদীতে বন্যা আসে, তখন জলরাশি দুকূল ছাপিয়ে ওঠে—স্রোতের বেগে দালান-কোঠা, গাছ-গাছড়া সব

কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়—এক জায়গায় মাটি আর এক জায়গায় এনে হাজির করে। তার তীব্রতার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারে না। তাই সবাই তার কাছে হার মানতে বাধ্য হয়। বন্যাপ্লাবিত নদীর প্রকৃতিই এই। তার মানে এ নয় যে মানুষ চেষ্টা করেও তার কোনো প্রতিবিধান করতে পারে না। সময় মত উচ্চ বাঁধের ব্যবস্থা করে ও অন্যান্য প্রতিষেধক উপায় অবলম্বন করে বন্যাপ্লাবিত নদীর যথেষ্ট গতিরোধ করা চলে। তখন তার অতিরিক্ত জলরাশি প্লাবনের সৃষ্টি না করে মানুষের ব্যবস্থা মতই নদী, নালা, খাল দিয়েই বয়ে যায়—মানুষের ক্ষতি করার শক্তি তার আর থাকে না। এই ভাবে মানুষের চেষ্টায় প্রাকৃতিক শক্তির যথেচ্ছচারিতা ও রুদ্রতা সংযত করা চলে। দৈব সম্বন্ধেও হুবহু এই কথাই খাটে। পুরুষকারহীন যে লোক দৈবের সঙ্গে লড়াই করে জয় প্রতিষ্ঠা চায় না, কিম্বা তার জন্যে প্রস্তুত নয়, দৈবের আধিপত্য তার উপরেই বেশী হয়ে থাকে। দৈবের পথ যেখানে খোলা—কোনো প্রতিবন্ধক নেই—বাধা দিতে কেউ নেই, সেখানে তার তোড়-জোড়েরও অন্ত থাকে না।

ইতালীর দৃষ্টান্তই ধরা যাক না। এখানে এত রকমের এত সব পরিবর্ত্তন হয়েছে, সে সব দৈবের খেলা বলেই যে কোনো লোকের মনে হবে। কিন্তু আসলে সে সব পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়েছে শুধু এই জন্যে যে, ইতালীর অবস্থা হয়েছিল যেন খোলা মাঠ আর কি—যার খুসী, সেই আসে, বাধা দিতে কেউ নেই। জার্ম্মানী, স্পেন ও ফরাসী দেশের মত যদি এ দেশের লোকও বীর্য্যের সঙ্গে দেশ-রক্ষায় বদ্ধপরিকর হোতো, তবে বাইরে থেকে এসে বিদেশী শক্তি এমন করে বার বার এ দেশটাকে আক্রমণ করতে ভরসাই পেতো না, কিম্বা কেউ এলেও, যতটা পরিবর্ত্তন বার বার হয়েছে, তা কখনই হ'তে পারতো না। অতএব মোটামুটি

তিনি যে কাজেই হাত দিতেন, ধীরে সুস্থে করতে পারতেন না। কাজে ক্ষিপ্রতা ও উদ্দামতাই ছিল তাঁর বিশেষত্ব। তাঁর প্রকৃতির এই প্রচণ্ডতাও সময় ও অবস্থার সঙ্গে এমন ভাবে খাপ খেয়ে গিয়েছিল যে, তিনি যে কাজেই হাত দিতেন, অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করতেন। বোলোগ্‌নার (Bologna) বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম অভিযানের কথাই ধরা যাক্ না। গিয়োভানি বেন্টিভোগলি (Giovanni Bentivogli) তখনও বেঁচে ছিলেন। ভেনেসিয়ানরা এ অভিযানে পোপের সঙ্গে যোগ দিতে রাজি হোলোনা। স্পেন-রাজও তাদের মতেই মত দিল। আর ফরাসী রাজও তখনও কিছু ঠিক করেননি—কি করা উচিত, সে সম্বন্ধে পোপের সঙ্গে তাঁর তখনো কথাবার্ত্তা চলছিল। কিন্তু পোপ কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, আপন স্বাভাবিক অসম সাহসিকতা ও উদ্যমশীলতার উপর নির্ভর করে কাজে নেমে পড়লেন—অভিযান সুরু হয়ে গেল। তাঁর কার্য্য পদ্ধতির এই অভাবনীয় আকস্মিকতায়, স্পেনরাজ ও ভেনেসিয়ানরা কি করা উচিত, ঠিক করতে না পেরে চুপ করে রইলো। ভেনেসিয়ানরা গেল ভয় খেয়ে আর স্পেন-রাজ ভাবলেন, এই সুযোগে যদি তিনি নেপেল্‌স্ পুনরুদ্ধার করতে পারেন, তার চেষ্টা দেখা ভাল। কিন্তু ফরাসী-রাজ ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, পোপের সঙ্গে যোগদান করতে বাধ্য হলেন। তিনি সব দিক বিবেচনা করে দেখলেন যে এই সময়ে পোপের সঙ্গে যোগদান না করলে তাঁর অসন্তোষের অন্ত থাকবে না। কিন্তু পোপকে অসন্তুষ্ট করলে তাঁর চলবে না। কেননা, ফরাসী-রাজের একান্ত ইচ্ছা যে সুযোগ বুঝে পোপের সাহায্য নিয়ে তিনি একবার ভেনেসিয়ানদের দর্প চূর্ণ করবেন। কাজেই পোপের সঙ্গে যোগদান করা ছাড়া তাঁর আর উপায় রইলো না। ফলে জুলিয়াস শুধু সাহস ও উদ্দামতায় যা করতে পারলেন, অন্য কোনো পোপ শত বুদ্ধি খরচ করেও

তা পারতেন না। অন্যান্য পোপরা নিশ্চয়ই তাঁর মত ধা করে কাজে নেমে পড়তেন না। তাঁরা হয়তো রোমে বসে বসে মতলব পাকাতে থাকতেন এবং সব আয়োজন সম্পূর্ণ করে, সব দিকে সব আঁট-ঘাট বেঁধে, তারপরে কাজে নামতেন। জুলিয়াসও যদি তাঁদের মত অত সূক্ষ্ম হিসাব করে চলতেন, তবে তিনি কখনো সফল হ'তেন না। কেননা, সে ক্ষেত্রে ফরাসী-রাজ হয়তো সে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে শত শত অজুহত সৃষ্টি করতেন এবং অন্যেরাও হাজার হাজার আশঙ্কার কথা তুলে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করবার চেষ্টা করতো।

জুলিয়াসের অন্যান্য কার্য্যাবলীর আলোচনা অনাবশ্যক। কেননা, সবগুলিই প্রায় একই রকমের এবং প্রত্যেক কাজটাতেই তিনি সাফল্য লাভ করেছেন। তিনি বেশীদিন বাঁচেন নি—তাই বিপরীত অভিজ্ঞতা লাভের তাঁর সুযোগ ঘটেনি। কিন্তু এমন অবস্থায় যদি তিনি পড়তেন, যখন হিসাব নিকাশ করে সাবধানতার সঙ্গে চলা আবশ্যক, তবে আর তাঁর পক্ষে সামলে চলা সম্ভব হোতোনা—ধ্বংস অনিবার্য্য হয়ে উঠতো। কেননা, তাঁর উদ্দাম প্রকৃতি তাকে যে পথে চালাতো, সে পথ থেকে তিনি কখনো ফিরতে পারতেন না।

অতএব এতক্ষণের আলোচনায় আমরা যা পেলাম, তা হচ্ছে এই। দৈব পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু মানুষের প্রকৃতি ও কাজের ধারা দৃঢ়বদ্ধ, স্থির। তাই এই উভয়ের ভিতরে যখন সামঞ্জস্য ঘটে, উভয়ের প্রবণতা একমুখী হয়, তখন সফলতা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যখন তা হয় না, তখন সফলতা নয়, বিফলতা অনিবার্য্য। এরূপ অবস্থায় আমার মতে, হিসেব খতিয়ে গড়িমসি করে চলার চেয়ে, দুঃসাহসিকতা ও উদ্দামতা অনেক ভাল। কেননা, সৌভাগ্য হচ্ছে কোমল প্রকৃতি নারীর মত। যদি তুমি তাকে নিজের আয়ত্তের ভিতরে রাখতে চাও, তবে তার সঙ্গে

দুর্ব্ব্যবহার করা ও মাঝে মাঝে তাকে ঠেঙ্গানো দরকার। এরূপ দেখা যায়, যারা উদ্দাম প্রকৃতির লোক নারী তাদেরই সহজে বশ হয়। কিন্তু যার তেজ নেই, আকাঙ্ক্ষার জোর নেই, ভাবের তীব্রতা নেই, কোনো নারী তেমন লোককে পছন্দ করে না। সৌভাগ্য নারীর মতই যৌবনকে ভালবাসে। কেননা যাদের ভরপূর যৌবন, তারা কখনই অতিরিক্ত সাবধানী হয় না—তেজবীর্য্য তাদের অফুরন্ত—জোর জবরদস্তি তাদের স্বভাব এবং এই জোর জবরদস্তির শাসনই তারা পছন্দ করে।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

"ওঠো, জাগো,—ইতালীর মুক্তি সাধনে তৎপর হও"

আমার যা বলবার, তা বলে শেষ করেছি। কিন্তু ভাবি, ইতালীর নব জন্ম লাভের এখনো কি সময় হয়নি! এমন কোনো শুভ লক্ষণ কি দেখা যায় না, যাতে বোঝা যায় যে ইতালীর নূতন করে বিপুল প্রচেষ্টার মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত? এমন কোনো ইঙ্গিত—কোনো শুভ সুযোগ সুবিধার আভাস কি চোখে পড়ে না, যাতে মনে হতে পারে যে কোনো জ্ঞানী, গুণী ও চরিত্রবান রাজা যদি চেষ্টা করেন, তবে তিনি ইতালীতে এক অতি মহান নব যুগের সৃষ্টি করে নিজেও অতুলনীয় অক্ষয় কীর্ত্তির অধিকারী হোতে পারেন, ইতালীরও অভূতপূর্ব্ব উপকার সাধন করতে পারেন। আমার তো মনে হয়, আজকের দিনে যে সুযোগ সুবিধা এসেছে, ইতালীর ভাগ্যে এমন আর কখনো জোটে নি।

একথা আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, মিশর দেশে ইহুদীগণ বন্দীদশা প্রাপ্ত হয়েছিল বলেই মুসা তার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

পারসীকগণ মিদিস্‌দের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়েছিল বলেই সাইরাসের (Cyrus) বীরত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের বিকাশ হয়েছিল। আথেনিয়ানরা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন-বিতাড়িত হয়েছিল বলেই থিসিয়ুসের (Theseus) কর্ম্ম-দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। এসব যদি সত্য হয়, তবে ইতালীর পক্ষেও দরকার হয়ে পড়েছে যে সে দুর্দ্দশার চরম সীমায় পৌঁছবে, যাতে ইতালী-সন্তান প্রমাণ করতে পারে—তার ভিতরে কত-

খানি মনুষ্যত্ব আছে। এই যে ইতালী আজ ইহুদিদের চেয়েও দাসের দাস হয়ে পড়েছে—পারসীকদের চেয়েও উৎপীড়িত—লাঞ্ছিত হচ্ছে—আথেনিয়ানদের চেয়েও বিতাড়িত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, আজ যে দেশ নেতাহীন, শৃঙ্খলাহীন, পরাজিত, লাঞ্ছিত, লুণ্ঠিত, শতখণ্ডে বিচ্ছিন্ন এবং সর্ব্ব রকমের অত্যাচার নীরবে নত মস্তকে বহন করছে—এর সত্যিই দরকার ছিল। তা না হলে, কেমন করে ইতালী-সন্তানের যোগ্যতা প্রমাণিত হবে ?

এই তো সেদিন ইতালীর কোন এক বিশিষ্ট সন্তানের ভিতরে খানিকটা প্রতিভার স্ফুরণ দেখা গিয়াছিল। মনে হয়েছিল, এতদিন পরে বুঝি বা ভগবান ইতালীর মুক্তির জন্য একজন ভাগ্যবান ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু তার প্রচেষ্টার মাঝখানেই অদৃষ্ট তার প্রতি বিমুখ হয়ে বেঁকে দাঁড়ালো। তাই মৃতকল্প ইতালী এখনো একান্ত মনে প্রতীক্ষা করে আছে, কবে কোন মহাপুরুষ এসে তার বুকের জ্বালা জুড়িয়ে দেবে—লম্বার্ডির লুটতরাজ ও তাস্কানির দুর্ব্বহ করভার ও কর্ম্মচারিবৃন্দের যথেচ্ছ প্রবঞ্চনা বন্ধ করে দিয়ে, তার সর্ব্বাঙ্গের ক্ষতে শান্তির প্রলেপ দিয়ে—মুক্তির আনন্দ দেবে ? সে দিনরাত ভগবৎসমীপে নিবেদন জানাচ্ছে, এমন কাউকে দয়া করে পাঠিয়ে দিতে, যে তাকে এই অপরিসীম দুঃখ-দুর্দ্দশা ও বর্ব্বরোচিত দর্পের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে। তাই যার চোখ আছে সেই দেখতে পাবে যে ইতালী কত উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে তাকে অনুসরণ করবার জন্য, যে ইতালীর মুক্তি-নিশান উড়িয়ে অগ্রসর হবে জয় গৌরবের পথে।

হে মহাত্মন্! আপনি ও আপনাদের মহিমোজ্জ্বল মেদিচি বংশই বর্ত্তমানে ইতালীর একমাত্র আশা ভরসা। আপনাদের শৌর্য্য বীর্য্যের অন্ত নেই। ঈশ্বর আপনাদের সহায়, দৈবও অনুকূল। তা ছাড়া চার্চ্চে

আপনার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি অপরিসীম, ফলে চার্চ্চ ও আপনাদের পক্ষে এরূপ অবস্থায় ইতালীর মুক্তি-সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করা আপনাকেই সাজে। এ ছাড়া আমি তো আর কাউকে দেখতে পাইনে, যিনি এই পবিত্র কাজের দায়িত্ব ও গুরুত্বের বোঝা বইতে পারেন। যে সব প্রাতঃস্মরণীয় মনিষিগণের কার্য্যাবলী আমি এই বইতে আলোচনা করেছি, তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে চললে এ কাজ আপনার পক্ষে কিছুই শক্ত নয়। এ কথা সত্য যে তাঁদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিত্ব ছিল বিপুল ও বিস্ময়কর। তা সত্ত্বেও, তাঁরা মানুষই ছিলেন এবং দেশ-কাল পাত্র অনুযায়ী তাঁদের কোনো সুযোগ সুবিধা বেশী ছিল না, যা আপনার নেই। তাঁদের কাজটা যে বেশী ন্যায়সঙ্গত ও অধিকতর সহজ ছিল তা-ও নয়, কিম্বা আপনার চেয়ে ভগবান যে তাঁদের বেশী বন্ধু ছিল, এমনও কোনো কথা নয়।

বরং ন্যায় আমাদেরই দিকে। কেননা, যে যুদ্ধ অনিবার্য্য, তাহাই ন্যায়সঙ্গত। বিশেষত যুদ্ধ ছাড়া যখন আর কোনো পথ নেই, মুক্তির আশা নেই তখন সে যুদ্ধ একান্ত পূত ও ভগবানের অভিপ্রেত। এরূপ যুদ্ধে মানুষের লড়াই করার আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ স্বভাবতঃই খুব বেশী হয়ে থাকে। এবং যে কাজে ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা খুব বেশী, বিপদ বাধা সেখানে ফুৎকারে উড়ে যায়। আপনিও যদি এই বইয়ে উল্লিখিত মহাপুরুষদের কার্য্যাবলী অনুসরণ করে চলেন, তবে আপনারও বিশেষ কোনো অসুবিধার কারণ ঘটবে না। তা ছাড়া, ভগবানের অপার মহিমা—তাঁর ইচ্ছায় কখন যে কি ভাবে সব ঘটনার সমাবেশ হয়, তা অতি বিস্ময়কর! তাঁর ইচ্ছায় সাগর দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পথ ছেড়ে দিয়েছে—মেঘ আগে চলে পথ দেখিয়েছে—কঠিন প্রস্তরে জলের উৎস ছুটেছে—আকাশ রুটি বর্ষণ করেছে। আপনাকেও ভগবান সব রকমে

বড় করেছেন। এখন আপনার এই শ্রেষ্ঠত্বকে কাজে খাটিয়ে ইতালীর মুক্তি সাধনের পক্ষে আর যা করা দরকার, তা আপনাকেই করতে হবে। ভগবান সব কাজ আমাদের করে দেন না। তাতে করে যে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা ও পুরুষকারের কোনো জায়গা থাকেনা এবং আমাদের আপন কাজের ফলে আমরা যে গৌরব লাভ করবো, তারও কোনো সুযোগ থাকে না। কিন্তু ভগবানের তা অভিপ্রেত নয়!

আপনার এবং আপনাদের বংশীয়দের কাছ থেকে দেশ যা আশা করে, তা এ পর্য্যন্ত আর কোনো ইতালী-সন্তানের পক্ষে করা সম্ভবপর হয়নি, তাতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। ইতালীতে যতগুলি বিপ্লব ও যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছে, তা থেকে মনে হোতে পারে যে ইতালী-সন্তানের সামরিক গুণাবলী একেবারেই লোপ পেয়েছে—যুদ্ধ করবার ক্ষমতা ও নৈপুণ্য হারিয়ে বসেছে। কিন্তু সে কথা ঠিক নয়। তবু কেন যে ব্যাপার এরূপ দাঁড়িয়েছে—তার কারণ হচ্ছে লড়াইয়ের পুরোণো বিধি-ব্যবস্থা—তা মোটেই ভাল ছিল না। অথচ পুরাতনের বদলে যথোপযুক্ত নূতন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করাও আমাদের কারো ক্ষমতায়ই কুলিয়ে ওঠেনি। নূতন রাজ্য স্থাপন করে, সেখানে নূতন আইন-কানুন ও বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা অত্যন্ত শ্লাঘা ও সম্মানের কথা। এ সব আইন-কানুন যদি সময়োপযোগী হয়, সুদৃঢ় ও উদার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে রাজা সহজেই সকলের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠবেন। বর্ত্তমানে ইতালীতে এরূপ কাজের সুযোগেরও অভাব নেই।

ইতালী-সন্তানের বাহুবলের অভাব নেই—অভাব মস্তিষ্কের। যে কোনো দ্বন্দ্বযুদ্ধে বা হাতাহাতি মল্লযুদ্ধে দেখা যায় যে, শারীরিক বল, কৌশল, কিম্বা চতুরতায় ইতালী-সন্তানের সমকক্ষ কেউ নয়। কিন্তু যখনি তারা সৈন্যদলে ভর্ত্তি হয়, তখন আর তারা কারো সঙ্গেই পেরে

ওঠে না। এর একমাত্র কারণই হচ্ছে, উপযুক্ত নেতার অভাব। যাদের যোগ্যতা আছে, তারা কারো কথা মানতে চায় না। প্রত্যেকেই মনে করে, সে সকলের চেয়ে বেশী বোঝে। তাদের মধ্যে যদি এমন কোনো লোক দাঁড়াতে পারতো, যে অদৃষ্ট গুণেই হোক, কিম্বা নিজের শৌর্য্য বলেই হোক, একটা অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তবে তাকেই হয়তো সবাই মেনে চলতো। কিন্তু তেমন লোক কেউ নেই। তাই তো আমরা দেখতে পাই যে গত বিশ বছর ধরে যখনি ইতালিয়ানদের দ্বারা গঠিত কোনো সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে নেমেছে, বার বার তারা অযোগ্যতা ও অক্ষমতারই পরিচয় দিয়েছে। এ কথার প্রথম সাক্ষী হচ্ছে ইল্ তারো (Il Taro),—তারপরে আরো কত জুটেছে—যথা, আলেকজেণ্ড্রিয়া (Alexandria), কাপুয়া (Capua) জেনোয়া (Genoa), ভাইলা (Vaila), বোলোগ্‌না (Bologna), মেস্ত্রী (Mestri) ইত্যাদি।

যে সব অদ্ভুতকর্ম্মা মনিষিগণ আপন আপন দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে সমর্থ হয়েছেন, আপনিও যদি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চান, তবে আপনার প্রথমেই দরকার দেশী লোকের দ্বারা সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা। আপন দেশের লোকের দ্বারা গঠিত সৈন্য যেমন খাঁটি ও বিশ্বাসী হয়, তেমন আর কোনো সৈন্য নয়। ইতালী-সন্তান যখন একা একা কোনো কাজে লাগে, তখন যে সে অদ্ভুত কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দেয়, তাতে সন্দেহ নেই। যখন দশে মিলে কাজ করা দরকার, তখন যে সে আরো বেশী যোগ্যতার পরিচয় দিবে, তাতেও সন্দেহ নেই—যদি তারা আপনা দেশী রাজার নেতৃত্বে কাজ করতে পায়,—যদি দেশী রাজার কাছ থেকে উপযুক্ত আদর যত্ন পায় ও তার খরচ খরচায় তারা প্রতিপালিত হয়। অতএব এরূপ সৈন্য সংগ্রহই সর্ব্বপ্রথম ও

সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন যাতে সময় কালে ইতালী-সন্তানই আপন শৌর্য্যে বীর্য্যে বিদেশী শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা করতে পারে।

সুইস (Swiss) ও স্পেনিস পদাতিক সৈন্য অপরাজেয় বলে মনে হতে পারে আপাতদৃষ্টিতে। কিন্তু তাদের একটা মস্তবড় খুঁৎ আছে, যার দরুণ তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে, যদি কোনো তৃতীয় পক্ষ উপযুক্ত কৌশল অবলম্বন করে তাদের সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসর হয়। তাদের অসুবিধা হচ্ছে এই যে, স্পেনিস সৈন্য অশ্বারোহী সৈন্যের সামনে দাঁড়াতে পারে না; আর সুইস সৈন্য, বিরুদ্ধপক্ষের পদাতিক সৈন্যের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধ করতে ভয় পায়। এই কারণে, তারা পূর্ব্বেও কখনো কখনো যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে, পরেও হয়তো হবে। যেমন—স্পেনিস সৈন্য যুদ্ধে ফরাসী অশ্বারোহী সৈন্যের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেনি এবং সুইস সৈন্য, স্পেনিস পদাতিকের হাতে হার মানতে বাধ্য হয়েছে। যদিও সুইসদের সম্বন্ধে পূরো প্রমাণ আমরা পাইনি, তবে রাভেনা (Ravenna) যুদ্ধের বিবরণ থেকে আমরা এ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করে নিতে পারি। সেখানে স্পেনিসদের সঙ্গে জার্ম্মানদের যুদ্ধ হয়েছিল। জার্ম্মানরা সুইসদের যুদ্ধ কৌশলই অবলম্বন করে চলে। অতএব এই যুদ্ধে জার্ম্মানদের যে অবস্থা হয়েছিল, তা থেকে অনায়াসেই বোঝা যেতে পারে, সে অবস্থায় সুইসদের কি দশা হোতো। সেই যুদ্ধে স্পেনিসরা যখন তাদের ঢাল-বরদারী ও চটপটে চলার ফলে জার্ম্মানদের হাতের কাছে এসে পড়লো, তখন আর জার্ম্মানদের সরকি চালাবার যো রইলো না—তারা নিতান্ত নিরুপায় হয়ে পড়লো। অথচ স্পেনিসদের তখন আর কোনো বিপদ রইলো না—তারা প্রবল বেগে আক্রমণ করতে লাগলো—আর জার্ম্মানরা নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তখন যদি অশ্বারোহী সৈন্য দৌড়ে এসে সামনে না দাঁড়াতো, তবে অবিলম্বেই

জার্ম্মানদের সব শেষ হয়ে যেতো। এই উভয় দেশের পদাতিক সৈন্যের অসম্পূর্ণতা জেনে নিয়ে, এমনভাবে নূতন একদল পদাতিক সৈন্য গড়ে তোলা যেতে পারে, যাতে তারা অশ্বারোহী সৈন্যকেও বাধা দিতে পারবে এবং অন্য পদাতিক সৈন্যের সঙ্গে লড়তেও ভয় পাবে না। এর জন্যে যে নূতন রকমের অস্ত্রধারী সৈন্য গড়ে তুলতে হবে, তা নয়—পুরোনো যা আছে, তারই খানিকটা সংস্কার করতে হবে—এই মাত্র। আপন সৈন্যবাহিনীর এরূপ উৎকর্ষ সাধনের ফলে যে নূতন রাজার শক্তি ও সুনাম বহুল পরিমাণে বাড়বে, তাতে সন্দেহ নেই।

অতএব আমার মতে এত দিন পরে ইতালীর মুক্তিদাতার আগমণের সময় এসেছে। এই শুভ সুযোগ যেন বৃথাই বয়ে না যায়। ইতালী যে কি আকুল আগ্রহ নিয়ে তার মুক্তিদাতার প্রতীক্ষায় বসে আছে, তা বলবার উপযুক্ত ভাষা আমার নেই। তিনি যখন আসবেন, তখন ইতালীর নগরে নগরে—প্রদেশে প্রদেশে সবাই তাকে ভক্তির অর্ঘ্য দিয়ে অভ্যর্থনা জানাবে। সমস্ত দেশের লোক,—যারা এত দিন বিদেশীর অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়েছে,তাদের উল্লাসের সীমা থাকবে না। সবাই তখন প্রতিশোধ নেবার জন্যে পাগল হয়ে—চোখে অশ্রু, বুকে অটুট বিশ্বাস ও মনে অবিচলিত আনুগত্য নিয়ে তার অনুসরণ করবে। কে এমন হতভাগা আছে, যে চোখের উপর দোর বন্ধ করে দেবে? কে তার হুকুম না মেনে পারবে? কোন ঈর্ষ্যাকাতর অমানুষ তার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে? কে না তার পূজায় সর্ব্বস্ব উজাড় করে ঢেলে দেবে? বর্ত্তমানের এই বর্ব্বরোচিত শাসন আমাদের সকলেরই একান্ত অসহ্য হয়ে পড়েছে। মহা গৌরবান্বিত বংশের সন্তান আপনি আপনিই এ মহাভার গ্রহণ করুন—আশা ও সাহসে বুক বেঁধে অগ্রসর হউন। আশা ও সাহসই সব কাজের সফলতার মূল। আমি একান্ত

মনে প্রার্থনা করি, আপনি ইতালীর মুক্তি-পতাকা উর্দ্ধে তুলে ধরুন—সেই পতাকাতলে মিলিত হয়ে আমার দেশবাসিগণ মহা গৌরবময় প্রতিষ্ঠার জন্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠুক এবং আপনার নেতৃত্বে মহাকবি পেত্রাকের (Petrarch) এই বাণী পূর্ণ সফলতা লাভ করুক :—

ধর্ম্ম সনে অধর্ম্ম আর
লড়বে কতক্ষণ।
নিমেষ মাঝেই নেতিয়ে যাবে
হাসবে জগজ্জন।
রোম এখনো মরেনিক'
অপার শৌর্য্য বীর্য্য,
যেমন ছিল তেমনি আছে
অটুট অসীম স্থৈর্য্য।

সমাপ্ত

নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার

তারিখ পত্র

নিম্ন চিহ্নিত শেষ তারিখ হইতে ১৫ দিন মধ্যে পুস্তক ফেরৎ দিতে হইবে। বিলম্বশুল্ক দিনপ্রতি ০-০৬ পয়সা।

প্রদান তাং	সভ্য নং	প্রদান তাং	সভ্য নং

নিশিকান্ত গাঙ্গুলী

আমেরিকার স্বাধীনতা	১।০
পরাধীনের মুক্তি	১৲
চলার পথ	১৲

শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

রাশিয়া	১॥০
সাম্যবাদ	১॥০

কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

চাণক্য	১।০
শিবাজী-গুরু রামদাস স্বামী	॥০

নরেন্দ্রনাথ রায়

কেদার রায়	॥০
সীতারাম রায়	॥০
ঝাঁসীর রাণী	॥০
বিজয়ী বাংলা	॥৵০
রাসপুটিন	৸০

অশ্বিনীকুমার দত্ত

প্রেম	॥০
দুর্গোৎসব তত্ত্ব	॥৵০

আশীষ গুপ্ত

ইহাই নিয়ম	১৲
বন্দিনী সুভদ্রা	১॥০
নব নব রূপে	১॥০